# রবিবারের আসর

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট্‌
কলিকাতা ৬

আমার আধুনিকতম গল্প সংগ্রহ 'বিষ পাথর' নূতন সংস্করণে 'রবিবারের আসর' নামে নব কলেবরে প্রকাশিত হল। 'বিষ পাথর' নামটি প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করতে হয়েছে। ক্রেতা একটি সরস মন নিয়ে বইয়ের দোকানে এসে আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও বইয়ের নাম দেখে পিছিয়ে গিয়েছেন ; মনের অভিপ্রায় মনে রেখেই অনেককে হাত গুটিয়ে নিতে হয়েছে শুনেছি। সেই জন্যই এ পরিবর্তন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

# বাঞ্ছাপূরণ

## ॥ এক ॥

আমার মনের রাধায় খুঁজে বেড়াই তিন ভুবনে।

রাধা আমার রইল কোথা, গোলকধাঁধার কোন গোপনে!

বহুবল্লভ বৈরাগীর গানের ভাঁড়ারের প্রথম ভাঁড়ে ওই গানটি আছে। যে কোন গৃহস্থের দরজায় এসে একতারা বাজিয়ে ওই গানটি সে ধরবেই।

এ কথা কেউ বললে সে বলে, গুরু ওই গানটিই পেরথমে শিখিয়েছিলেন বাবা। ভাঁড়ারের কৌটো-বাটার পয়লা কৌটোয় আছে। ভাঁড়ার খুললেই ওই কৌটোতেই হাত পড়ে যে।

বুড়ো হয়ে এসেছে বহুবল্লভ। চেহারাখানি ভাল, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ রঙ। লম্বা পাকা চুল, দাড়ি গোঁফ কামানো। বহুবল্লভ গৃহস্থ বৈষ্ণবের ছেলে। পরিচ্ছন্ন ক্ষারে-কাচা কাপড় পরিপাটি ক'রে পরে, গায়ে দেয় একখানি চাদর, বেশ মিহি করে তিলক রচনা করে, বুড়ো বহুবল্লভের বয়স হলেও বিলাস যায় নাই। মাথায় গন্ধ-তেলও মাখে। নগরের বিলাসপরায়ণ বৃদ্ধদের সঙ্গে বহুবল্লভের তুলনা করা যায়। বিলাসপরায়ণ নাগরিক-বৃদ্ধেরা গাম্ভীর্যের মাত্রা বাড়িয়ে সম্ভ্রম দিয়ে বৃদ্ধ বয়সের বিলাসের লজ্জাকে ঢাকেন। বহুবল্লভের সঙ্গে এইখানে তাঁদের পার্থক্য, বহুবল্লভের শরমও নাই, সম্ভ্রমেরও ধার ধারে না। এ কথা বলে তাকে কেউ লজ্জা দিতে চাইলে লজ্জা পাওয়া দূরে থাক, বহুবল্লভ হাসে।

হাসতে হাসতেই বলে, যার যা, তা না হ'লে চলবে ক্যানে গো বাবা? মদনমোহন ছাড়া আর কাউকে রাধা দেখা দেয়? আর মদনমোহন তো শুধু রূপ থাকলেই হয় না, মদনমোহনের বেশও তার রূপের মতন। মোহনচূড়া চাই, তাতে থাকা চাই ময়ূর পাখা, তাও আবার বাঁকা করে লাগাতে হয়, পীতধটী চাই, পায়ে নূপুর চাই, কপালে অলকাতিলকা চাই।

হ্যাঁ, মোহনবংশী চাই হাতে।

হা-হা করে হেসে ওঠে বহুবল্লভ। বলে, ওখানে টেক্কা মেরেছে বহুবল্লভ। বহুবল্লভের গলাতেই আছে বাঁশী। তার জন্যে আর বাঁশের পাব ছেঁদা করতে হয় না।

বিচিত্রচরিত্র মানুষ! লোকে বলে, অদ্ভুত। সেই প্রথম জীবন থেকেই চরিত্রে বহুবল্লভ একই রকম। মধ্যে মধ্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। শুধু হাতে-পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে, ব্যাস্, নিখোঁজ হয়ে যায়। একতারা বাঁয়া আর ঝুলিটা অহরহ সঙ্গে থাকে বলেই ওগুলি ফেলে যায় না। ঘরে তালা ঝোলে, বাইরে উঠানেই দড়িতে কাপড় শুকায়, দাওয়ার এককোণে খেজুরপাতার চ্যাটাই এবং মাদুরখানা ঠেসানো থাকে, ছোট একটা জলচৌকি থাকে, রান্নাঘরের দাওয়ার একপাশে খানিকটা রাঙামাটি ও খানিকটা কাঁচা গোবর থাকে, উনানের পাশে ঘুঁটে থাকে, কিছু ডালপালা থাকে, লাউমাচায় লাউ ঝোলে, লঙ্কা গাছে লঙ্কা ধরে থাকে অজস্র, ফুল গাছে ফুল ফুটে থাকে, এমন কি ব্যবহারের জলের পাত্র ছোট মাটির পাতনাটি পর্যন্ত জলে পরিপূর্ণ থাকে। বাড়ির চারিদিকে পাঁচিল নাই, বেড়া আছে, রাস্তা থেকে বেড়ার ওপারে বাড়িখানাকে দেখে মনে হয়, মানুষটা বোধ হয় এলো বলে।

কিন্তু কোথায় কে? এক দিন, দু'দিন, তিন দিন, তিন মাস, চার মাস, ছ' মাস, আট মাস চলে যায়, সে মানুষ আর ফেরে না। বাড়িতে ধূলো জমে, কাপড়খানা অদৃশ্য হয়, খেজুর চ্যাটাই ও

মাদুরখানাকে ঘিরে উইপোকার ঘর ওঠে, জলচৌকিখানাও যায়, জালাটাও ভাঙে, রান্নাঘরের দাওয়ায় কাঁচা গোবর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, ঘুঁটেগুলো কাঠগুলো ধুলোয় ঢাকা পড়ে, লাউমাচার লাউ যায়, লাউডগা যায়, লঙ্কাগাছটার লঙ্কা ফুরিয়ে যায়, ক্রমে ম'রেও যায়; ফুলগাছগুলি তো যায় সর্বাগ্রে। গ্রামের লোকে বিস্মিতও হয় না, চিন্তিতও হয় না। অঞ্চলের লোকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করে, কোথায় গেল সুকণ্ঠ সুন্দর মানুষটি!

হঠাৎ আবার একদিন দুয়ারে বেজে ওঠে একতারার শব্দ—গ্যাঁও, গ্যাঁও, গ্যাঁও। তারই সঙ্গে বাঁয়াতেও ওঠে বার দুয়েক গুবুং-গুবুং শব্দ।

রাধে, রাধে! রাধে রাধে বল মন। রাধারাণীর জয় হোক!—এসে দাঁড়ায় সেই বহুবল্লভ। এক হাতে একতারা, অন্য হাতে বাঁয়া, পরনে পরিপাটী পরিচ্ছন্ন কাপড়, গায়ে চাদর, কপালে তিলক, সোজা সরু সিঁথি-কাটা সযত্নবিন্যস্ত লম্বা চুল, মুখে হাসি। এসেই বেশ আসন পিড়ি হয়ে ব'সে কোলের ওপরে বাঁয়াটি তুলে নেয়, ডান হাতে একতারা বেজে ওঠেঃ—গ্যাঁও; গ্যাঁও, গ্যাঁও; বাঁ হাতে বেজে ওঠে—গুব্ গুব, গুব্ গুবুং, গুবু, গুবু গুবু। লোকে প্রশ্ন করে, বহুবল্লভ!

হ্যাঁ বাবা। ভাল আছেন?

তা আছি। কিন্তু তুমি—

আজ্ঞে বাবা, বহুবল্লভ মন্দ থাকে না। ভালই ছিলাম।

তা তো ছিলে। কিন্তু ছিলে কোথা এতদিন?

এই ঘুরে এলাম দিনকতক।

দিন কতক? দিন কতক কি হে? মাস ছয়েক তো বটেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা বটে।

তবে?

তবে—। হাসে বহুবল্লভ। বলে, রাধার সন্ধানে ছুটলে দিন

তো দিন—মাস, বছর, জন্ম হুঁশ থাকে না বাবা। কত দিন হুঁশও ছিল না, হিসেবও নাই।

তাহ'লে তীর্থে গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ, তা যা বলেন। ন্যান, এখন গান শুনেন। বলতে বলতে একতারা আর বাঁয়া একসঙ্গে বেজে ওঠে—গ্যাঁও গ্যাঁও, গুবুং গুবুং, গ্যাঁও গ্যাঁও। নিজেও গান ধরে দেয়,—আ—আহা।

ও আমার মনের রাধায় খুঁজে বেড়াই তিন ভুবনে।

তারপর পদাবলী, শ্যামা বিষয়, দেহতত্ত্ব—গানের পর গান। গানে মেতে ওঠবার আশ্চর্য ক্ষমতা বহুবল্লভের।

* * * *

মিথ্যা বলে না বহুবল্লভ। সত্যটা একটু ঘুরিয়ে বলে শুধু। বৈষ্ণবী ভেকে যেমন ঢাকা পড়েছে ওর আসল চেহারাটা, তেমনিই কথাগুলির উপরেও রাধানামের রঙের ছোপ পড়ে নগ্ন অর্থ রঙচঙে হয়ে পড়েছে—সে ঢাকা পড়ারই সামিল। কিন্তু তার জন্য বহুবল্লভের অপরাধ নাই। কেউ তাকে পরিষ্কার প্রশ্ন করলে পরিষ্কার উত্তর দিতে এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধা করবে না। প্রশ্ন কেউ করে না। কারও প্রয়োজন হয় না। নিজে থেকে বলবে, এমন অন্তরঙ্গ এঁরা নন। তা ছাড়া অন্তরঙ্গই বা কে আছে বহুবল্লভের। আপনজন তো নাই-ই, বন্ধু বলতেও কেউ নাই। সংসারে সে আশ্চর্য রকমের একা। মা ছিল, অনেক আগেই খালাস পেয়েছে। বিয়ে করেছিল, স্ত্রী বৎসর কয়েক পরই মালাচন্দনের মালা ছিঁড়ে এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে চলে গিয়েছে। সুতরাং নিজে থেকে সকল কথা পরিষ্কার করে বলবেই বা কাকে বহুবল্লভ ?

একজন আছে, সে বিভূতি দাস। বিভূতি দাসও এখানে নাই, এখান থেকে ক্রোশ ছয়েক দূরে গিয়ে বাস করছে। সে এখন ঘোর সংসারী, স্ত্রীপুত্র জমিজমা পুকুর গরু-বাছুর—অনেক কিছুর মধ্যে সে একেবারে ডুবে রয়েছে।

অথচ—। বিভূতির কথা মনে হলে ঘাড় নেড়ে নেড়ে হাসে বহুবল্লভ।

বিভূতির আসল নাম বিভূতি কর্মকার। ও-ই তাকে ওই মনের রাধার গানখানি শিখিয়েছিল।

মনের রাধা! মনের রাধা!—দীর্ঘশ্বাস ফেলে বহুবল্লভ।

পরনে কালো মখমলের ঘাগরা, লাল মখমলের জামা, মাথায় এলোচুলের ওপর ময়ূরপাখা-দেওয়া মুকুট, হাতে কঙ্কন, বাঁ হাতে বাজুবন্ধ তাবিজ, গলায় চিক মুক্তার মালা, পায়ে নূপুর, কপালে অলকাবিন্দু, নাকে ও মাঝ-কপালে তিলক, বংশীধারীর বাঁশীর সুরে পাগলিনী রাধা!

চোখ বুজলে আজও দেখতে পায় বহুবল্লভ। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গাছতলায় বসে চোখ বুজে সেই রাধাকে মনে পড়লেই কানে গানের সুরও বেজে ওঠে।

ও নিঠুর কালিয়া—অবলায় দুখ দিলি রে নিঠুর কালিয়া! চোখ মেলে ওঠবার জন্য প্রস্তুত হয়েও বহুবল্লভ উঠতে পারে না; কিছুক্ষণের জন্য সর্বাঙ্গ যেন অবশ মনে হয়, দিন-দ্বিপ্রহরে প্রখর রৌদ্রের মধ্যেও কয়েক মুহূর্তের জন্য সে চোখে কিছুই দেখতে পায় না।

দশ বছরের বহুবল্লভ তার গ্রামের লোকের সঙ্গে রায়বল্লভপুর বাবুদের বাড়ী যাত্রাগান শুনতে গিয়েছিল। রাধাগোবিন্দজীর দোলে যাত্রা হ'ত বাবুদের বাড়ী। অধিকারী বৃন্দাবন মুখুজ্যের কৃষ্ণযাত্রার পালা হচ্ছিল মাথুর। সেই পালায় দেখেছিল ওই রাধাকে।

আশ্চর্য, রাধাময় হয়ে গেল সব। বাড়ি ফিরল, কেমন যেন হয়ে গেছে তখন। সাতটা দিন পরপর স্বপ্ন দেখেছিল রাধাকে। তারপর আবার সহজ হ'ল ক্রমে ক্রমে। কিন্তু যখনই শুনত কীর্তনগান, ভাগবতের কথা, রাধাকৃষ্ণের নাম, তখনই মনে পড়ে যেত।

বৎসর ঘুরে আবার এল দোল।

এবার সে আবার ছুটল। সেই বারই তার পালানোর শুরু। সেবার ফাল্গুন মাসে দোলের সময় নেমেছিল অকাল বাদল। শীতের আমেজ তখনও যায় নি, তার উপর বৃষ্টি, সে বৃষ্টিতে বৃন্দাবন মুখুজ্জের যাত্রা শুনতে গাঁয়ের লোকের উৎসাহ ছিল না, বৃন্দাবনের যাত্রা তারা বাবুদের বাড়িতে বিশ বছরেরও বেশি শুনে আসছে। বহুবল্লভ কিন্তু পাগল হয়ে গিয়েছিল। মাকে কিছু না বলেই সে সন্ধ্যের আগেই রওনা হয়েছিল।

সেই রাধা। মাথায় এলো চুলের ওপর ময়ূরপাখা দেওয়া মুকুট, কপালে অলকা-তিলক, হাতে কঙ্কন বাজুবন্ধ তাবিজ, গলায় চিক-মালা, সেই রাধা।

বাবুদের ঠাকুর-বাড়িতে প্রসাদ চেয়ে খেয়ে নাটমন্দিরের একপাশে কুকুরগুলির সঙ্গে শুয়ে রাত্রি কাটিয়ে তিন দিন যাত্রা শুনে সে বাড়ি ফিরল।

যতবার রাধা আসর থেকে বেরিয়ে সাজঘরে গেল, সেও গেল তার পিছনে পিছনে, চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সাজঘরের সামনে; রাধা আসরে এলে সেও এসে আসরে বসল। যাত্রা ভাঙল; সাজঘরের সামনে সে দাঁড়িয়ে রইল দীর্ঘক্ষণ। দলে দলে বেরিয়ে গেল যাত্রার দলের লোকেরা ছেলেরা, তারা শোবার জন্য চ'লে গেল বাসায়, বহুবল্লভ দাঁড়িয়েই রইল টিপিটিপি বৃষ্টির মধ্যে। কোথায় রাধা? গভীর রাত্রিতে একা পথের উপর দাঁড়িয়ে থেকে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে নাটমন্দিরের কোলে গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ল। সকালে উঠে দেখলে তার দু পাশে শুয়ে আছে দুটো কুকুর। উঠে আবার দাঁড়াল গিয়ে সাজঘরের সামনে, সেখান থেকে যাত্রার দলের বাসায়। সারাটা দিন ঘুরলে। কোথায় রাধা?

রাত্রে যাত্রা শুরু হ'ল। সে দাঁড়িয়ে ছিল সাজঘরের সামনে রাধা বেরিয়ে এল। বহুবল্লভ সতেজ হয়ে উঠল, উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, গিয়ে সে বসল আসরে।

পর পর তিন দিন। কিন্তু আশ্চর্য, তিন দিনই রাত্রের ওই যাত্রার আসরের রাধাকে দিনে সে যাত্রার দলের ছেলের মধ্যে আবিষ্কার করতে পারে নি। এমন কি মালকোঁচা মেরে, গেঞ্জি গায়ে, মুখে অলকা-তিলকা এঁকে বিভূতি পোশাক পরবার আগে বিড়ি খেতে বাইরে এসেছে, তবু চিনতে পারে নি।

তিন দিন পর যাত্রার দল বিদায় নিলে সে বাড়ি ফিরল।

ফেরবার পথে গাছতলায় বিশ্রাম করতে বসে দেখতে পেলে রাধাকে। যে দেখা সে আজও দেখতে পায়, সে দেখার শুরু সেই। কেঁদেছিল সেদিন বহুবল্লভ।

## ॥ দুই ॥

আজও প্রৌঢ় বয়সে বহুবল্লভ কখনও কখনও কাঁদে। কেঁদেই আবার চোখ মুছে হাসে। রাধে রাধে! মনে মনে বাল্যকালের বুদ্ধি এবং বোধের অসারতা উপলব্ধি করে হাসে। রাধে রাধে!

হাসি মিলিয়ে গিয়ে আবার বহুবল্লভের মুখ কেমন হয়ে যায়। চোখে ফুটে ওঠে আকাঙ্ক্ষা-প্রখর দৃষ্টি। তার সঙ্গে একটি প্রশ্নও জেগে ওঠে। দাড়িগোঁফ কামানো নিটোল মুখে প্রৌঢ়ত্বের যে রেখাগুলি পড়েছে, সেই রেখাগুলি ধরেই অতৃপ্তির বেদনার বার্তা দেখা যায়। জীবনের যে অবিস্মরণীয় কথাগুলি সাংকেতিক অক্ষরে অদৃশ্য কালিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, অন্তরের আগুনের আঁচে উত্তপ্ত হয়ে সে লেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রাধা কোথায়—এ খোঁজে ঘোরা কম হ'ল না। যাত্রার সাজঘরে রাধা নাই—এ ভুল যেদিন ভাঙল সেদিন থেকেই ঘুরছে সে।

ওই বিভূতিই তার ভুল ভেঙে দিয়েছিল, খিলখিল করে হেসে উঠেছিল, বলেছিল—রাধে রাধে! বিভূতি ছিল অশ্লীল কথার ঘুঘু।

যা বলেছিল তার অর্থ, যাত্রার দলে কি রাধা থাকে! রাধা রাধা—ওই দেখ দল বেঁধে রাধা চলেছে। ওরাই হ'ল আসল রাধা।

শেখরেশ্বর শিবের শিবচতুর্দশীর মেলায় ঘুরতে ঘুরতে দুজনের কথা হচ্ছিল। বিভূতির সঙ্গে তার আগেই আলাপ হয়েছে রায়বল্লভপুরে যাত্রাগানের আসরে। তিন বছরে সাহস হয়েছিল, আলাপের পথও পেয়েছিল, রায়বল্লভপুরের ছেলেরা পান ছুঁড়ে দিচ্ছিল রাধাকে। সেও সাহস করে পান ছুঁড়ে দিয়েছিল। রাধা উপেক্ষা করে নাই, পানের খিলিটি তুলে নিয়ে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। একটু হেসেও ছিল। আসরের বাইরের সাজঘরের সামনে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিজেই রাধা কথা বলেছিল, তুমি তখন পান দিলে না?

হ্যাঁ।

বেশ পান। কোন্ দোকানের?

আর খাবে? আনব?

আন। ওরা পান দিলে, ছাই পান। না সুপুরি, না মসলা, না তাম্বুলবিহার।

পান আনতে ছুটেছিল বহুবল্লভ।

পিছন থেকে ডেকে রাধা বলেছিল, শোন।

অ্যাঁ?

সিগারেট এনো ভাই।

সিগারেট?

হ্যাঁ। একটা সিগারেট এনো।

পাঁচটা সিগারেট এনেছিল,—রেলওয়ে মার্কা সিগারেট। চার পয়সা বাক্স ছিল তখন। রাধার সাজে সেজেই সেদিন সে বহুবল্লভের গলা জড়িয়ে ধরে পানের দোকান থেকে আসরের মুখ পর্যন্ত গিয়ে বলেছিল, আমি বেরিয়ে এলেই তুমি উঠে এসো। আচ্ছা?

পর পর তিন দিন আলাপের পর বিভূতি বলেছিল, শিবচতুর্দশীতে শেখরেশ্বর তলায় মেলায় যাবে না ?

শেখরেশ্বরের মেলা ?

হ্যাঁ, এই তো এখান থেকে চার কোশ পথ। ওখানে আমাদের বায়না আছে।

আসবে তোমরা ? তাহলে আসব।

মেলায় গিয়ে ছুজনে নিবিড় আলাপ হয়ে গেল। কথায় কথায় বহুবল্লভ বললে, জান, রাধা সাজলে ভারি সুন্দর দেখায় তোমাকে। মনে হয় সত্যিই রাধা। তোমাদের সাজঘরের দোরে দাঁড়িয়ে থাকতাম, যাত্রা ভাঙলে রাধার সঙ্গে যাব বলে, তা তুমি পোশাক ছেড়ে বেরুলে আর—

বাকিটা বলতে দিলে না আর বিভূতি, খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে, যাত্রার দলে কি আর রাধা থাকে। রাধারা ! ওই দেখ না—দল বেঁধে রাধা বেরিয়েছে। মেলার পথে পাঁচ-সাতটি তরুণী মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তাদের দেখিয়ে দিলে আঙুল দিয়ে। তারপর বললে, এস, রাধাদের সঙ্গে কথা বলি।

না।—তার উপরের হাতটা চেপে ধরেছিল বহুবল্লভ।

কেন ?—খিলখিল ক'রে হেসে উঠেছিল বিভূতি।—ভয় লাগছে ?

*       *       *       *

ভয় চলে গেল যাত্রার দলে ঢুকে। টানলে বিভূতি। বললে, আয় দলে, দেখবি বাঁশির সুরে রাধা কেমন আপনি ফিরে তাকায়।

বিভূতি তখন চুম্বক আর বহুবল্লভ তখন লোহার টুকরো। বিভূতির আকর্ষণ প্রতিরোধের শক্তি তখন ছিল না তার। তখনও বিভূতি রাধা সেজে আসরে নামলে ও সব ভুলে যেত। ঢুকল যাত্রার দলে। অধিকারী সাগ্রহে নিলেন তাকে। সুন্দর চেহারা, বাঁশীর মত কণ্ঠ। সমাদর করে দলে নিয়ে অধিকারী বললেন, এক বছর পরে দেখবে তোমার কদর।

সখীর দলে নামল প্রথম। প্রথম দিন ভাল করে চাইতে পারেনি আসরের দিকে। যে দিন চাইতে পারলে, সেদিন অবাক হয়ে গেল। কত চোখ জ্বলজ্বল করে তাকে দেখছে।

তারপর—

তারপর আর ভাবতে পারা যায় না। সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যেতে চায়। একদিনের কথা মনে হলেই বহুবল্লভ হঠাৎ ঘাড় নেড়ে বলে ওঠে, দূর! যা!

বিভূতি তাকে একটা মেলার আসর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, সুট করে চলে আয়, আর কেউ যেন না দেখে।

মেলার দোকানের সারির একটা গলি দিয়ে অন্ধকারে পিছনে এসে দাঁড়াল।

কি?

এই নে রাধা।—চাপা হাসি হেসে উঠল বিভূতি।

* * * *

হে—ই! হে—ই!

চীৎকার করে ওঠে বহুবল্লভ। নির্জন প্রান্তরে গাছতলায় বসে থাকতে থাকতে চীৎকার করে উঠল। রুক্ষ প্রকৃতি, লাল মাটির প্রান্তর চারি দিকে চলে গিয়েছে। মধ্যে মধ্যে বটের গাছ এখানে ওখানে। হঠাৎ গাছের ডাল থেকে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল সাঁওতালদের মেয়ে। গাছের উপর উঠে সে আঁচল ভরে বটবিচি সংগ্রহ করছিল, চীৎকার শুনে লাফিয়ে পড়েছে! ভেবেছে, নীচের বুড়া তাকেই হাঁক মেরে তিরস্কার করছে।

কি বুলছিস?

ভুল করে সোনায় না গ'ড়ে রাধাকে কালো কষ্টিপাথরে গড়লে কোন কারিগর? মাথায় লাল জবাফুল? অবাক হয়ে চেয়ে রইল বহুবল্লভ।

হঁকাইছিস ক্যানে তু?

গান শুনবি? গান?

হাতের একতারা বেজে উঠল সঙ্গে সঙ্গে, গ্যাঁও গ্যাঁও। বাঁয়াটাও বেজে উঠল, গুব গুবুর।

লে, গান কর্। লে তাই, শুনি তুর গান। হ্যাঁ হ্যাঁ, লে গান কর্।

আ—হা—আ—

ও আমার মনের রাধায় খুঁজে বেড়াই তিন ভুবনে!

কে জানত, এই তেপান্তরের মাঠে গাছের তলায় তাকে দেখা দেবার জন্য দাঁড়িয়ে ছিল!

গান শেষ করে বহুবল্লভ বললে—ফুল নিবি? ফুল?

ফুল? দে।

ভিক্ষেয় গিয়ে বাবুদের বাগান থেকে তুলে এনেছিল কটি দোলনচাঁপা ফুল। আশ্বিন মাসের আকাশে সাদা মেঘের মত নরম সাদা ফুল। তেমনি মৃদুমদির গন্ধ।

নে। মাথার জবা ফুল ফেলে দে। ছাই! ভাল লয়।

কুথা আছে ই ফুল? তুর বাড়িতে?

আছে। তোকে আমি রোজ দেব। দুপুরবেলা এইখানে থাকিস। রোজ দেব।

গান শুনাবি না? গান। ভাল গান তুর।

শুনাব। রোজ—রোজ—রোজ—

অ—ন—ন্ত—কা—ল শুনাবে সে। এতদিন তো তাকে শুনাবার জন্যই সে পথে মাঠে ঘাটে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গান গেয়ে এসেছে।

হাতের একতারা আবার বেজে ওঠে—গ্যাঁও, গ্যাঁও, গ্যাঁও।

* * * *

মাসখানেক না যেতেই বুড়া বহুবল্লভ আপন মনেই বলে, রাধে! রাধে! রাধে! রাধে! কোথায় রাধা! আ, ছি ছি ছি!

বহু দিন—বহু দিন হয়ে গেল যাত্রার দলে থাকতেই বিভূতি তাকে একদিন মদ খাইয়েছিল। ওঃ ওঃ বুকটা জ্বলে গিয়েছিল। দেহের সমস্ত অভ্যন্তরটা একেবারে কুঁকড়ে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। সেদিনের পর আর সে মদ খায় নি, কিন্তু এমনি ভাবে হঠাৎ মনে পড়ে যায়।

আঃ, ছি!

বটতলার অনেকটা আগে সে অন্য দিকে পথ ভাঙে। অনেক দূর এসে একটা গ্রামের প্রান্তে পুকুরের ঘাটে এসে বসে। চোখ বন্ধ করে একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে থাকে।

বন্ধ চোখের দুটি কোণ থেকে দুটি ধারা নেমে আসে।

মনে হয় গান শুনতে পাচ্ছে—

অবলায় দুখ দিলিরে নিঠুর কালিয়া—

ও নিঠুর কালিয়া—

মাথুর পালার রাধা গান গাইছে।

অনেকক্ষণ পরে উঠে ঘুরে ঘুরে এসে বাড়ি উঠল। পরের দিনকয়েক বাড়ি থেকে বের হ'ল না। তার পরদিন বের হ'ল। এবার রায়বল্লভপুরের দিকে নয়, পথ ধরল বিপরীত মুখে, ক্রোশ আড়ায়েক দূরে হাটচরণপুর। রায়বল্লভপুরের পথে রাধা নাই। ভুল। ভুল। ও রাধা নয়, ও তার মরণ। ও-পথে গেলে অবধারিত মৃত্যু।

ও পথে অবধারিত ধ্বংস।

—এই কথাটা বলেছিলেন, তার গুরু সতীশ মুখুজ্জে।

যেদিন সে মদ খেয়েছিল, ঠিক তার পরদিন মুখুজ্জে এসে পৌঁছেছিলেন। মুখুজ্যে ছিলেন দলের বাজিয়ে গিরিশ মুখুজ্জের বড় ভাই। আগে তিনিও বৃন্দাবন অধিকারীর দলে ছিলেন। বছর তিনেক আগে সন্ন্যাস নিয়ে দল থেকে চলে গিয়েছেন। তবুও দেশে

ফিরে একবার দলের খোঁজ না নিয়ে পারেন নাই। এসেছিলেন রাত্রে। সকালে ডাকলেন বহুবল্লভকে। রাত্রের আসরে ছেলেটির কণ্ঠস্বর শুনে ভাল লেগেছে, আরও কিছু ভাল লেগেছে। মুখুজ্জেকে আগে দলের লোকেরা বলত, পাকা জহুরী। গান কার হবে, কার হবে না—এ তিনি একবার মুখ খুললেই বলে দিতে পারেন। নিজে সুকণ্ঠ গায়ক, তার উপর তিনি মুখে মুখে গান রচনা করে গাইতেন, একেবারে আসরে দাঁড়িয়ে গান বেঁধে গাইতেন সতীশ মুখুজ্জে। এখন সন্ন্যাস নেওয়ার পর লোকে তাঁকে বলে—সাধক মানুষ, সিদ্ধ গায়ক। যাকে তাকে তিনি ডাকেন না। বহুবল্লভকে ডাকতেই বহুবল্লভ কেমন হয়ে গেল।

তার গায়ে যে এখনও মদের গন্ধ উঠছে! মাথা খসে পড়ছে। মুখ বিস্বাদ হয়ে রয়েছে। নিজের নিশ্বাসে নিজেই সে দুর্গন্ধ অনুভব করছে।

তবুও সতীশ মুখুজ্জে ডেকেছেন, না গিয়ে উপায় ছিল না। সংকুচিত হয়ে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ঘরে ঢুকল না।

মুখুজ্জে নিজেই উঠে কাছে এসে মাথায় হাত দিয়ে বোধ হয় অভয় বা আশীর্বাদ দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার পরিবর্তে হাত সরিয়ে নিয়ে বলেছিলেন, আরে রাম রাম! এর মধ্যে এ শিখলি কি করে, কার কাছে? যা যা, চান-টান কর্ গে যা। আঃ এমন সুন্দর কণ্ঠ—

লজ্জায় মরে গিয়েছিল বহুবল্লভ। পালিয়েই আসছিল। মুখুজ্জে ডেকে বলেছিলেন, শোন্ শোন্ কত দিন ধরেছিস?

উত্তর দিতে পারে নাই বহুবল্লভ।

মুখুজ্জে বলেছিলেন, আর যেন খাস না। বুঝলি? মরবি।

বিকেলে তাকে ডেকে মাথায় হাত দিয়ে সস্নেহে অনেক বুঝিয়ে শেষে বলেছিলেন, এ পথে অবধারিত ধ্বংস।

মদ সে আর খায় নি।

মুখুজ্জেই তাকে দল ছাড়িয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোর মূলধন আছে, তোকে দিয়ে কারবার হবে। আমার গানগুলো শেখ, আর অন্য পদও শেখ। যাত্রার দলে থাকিস নে। মরবি শেষ পর্যন্ত। বৈষ্ণবের ছেলে, গান গেয়ে অনেক রোজগার হবে। আমারও পদগুলো থাকবে।

মুখুজ্জেই দল থেকে নিয়ে গিয়ে গান শিখিয়ে দীক্ষা দিয়েছিলেন, বিয়ে দিয়ে তিনিই তাকে সংসারী করেছিলেন।

বিয়ে করে কদিন মনে হয়েছিল, পেয়েছে রাধাকে।

বউয়ের নাম ছিল কুসুম, কিন্তু ও তাকে ডাকত রাধে বলে।

* * * *

বহুবল্লভের মনে হয়, সে মনে হওয়া তার গুরুর মায়ায়। তিনিই তাকে ভুলিয়ে রেখেছিলেন। নইলে—। হাসি দেখা দেয় বহুবল্লভের মুখে।

হাটচরণপুরে রেল ইষ্টিশান আছে। ইষ্টিশানের মুশাফেরখানায় গান গাইতে যায় বহুবল্লভ। কত মানুষ আসে যায়। গান গায় আর চারিদিকে প্রচ্ছন্ন অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে তাকায়। বার বার সে চেষ্টা করে চোখ দুটোকে ইষ্টিশানের ওপারের গাছের মাথার ওপরে তুলে নিষ্পলক হয়ে চেয়ে চেয়ে থাকতে, রোদের ছটায় ফিকে নীল আকাশের টুকরোটুকুর গায়ে গাছটার ওই একটা ডালের মাথার টুকরোটুকু ছাড়া বাকি সব মুছে যাক! চোখের পলক সে কিছুতেই ফেলত না। পলক পড়লেই ওইটুকু পলকে গোটা আকাশ ফুটে উঠবে, গাছটা গোটা চেহারা নিয়ে দাঁড়াবে সামনে, গাছটার গোড়ার মাটিটুকু চারিপাশে ছড়িয়ে যাবে। নিষ্পলক হয়ে গাছের মাথার দিকে চেয়ে গান গায়।

হঠাৎ বেজে ওঠে ঝুম-ঝুম শব্দ, অথবা ঠিন্-ঠিন্ ধ্বনি, কিংবা কণ্ঠস্বর, শোন শোন। ওগো! বুকের ভেতরটা চমকে ওঠে বহুবল্লভের—আসরে রাধা ঢুকল! পায়ের নূপুর, হাতের কঙ্কন ধ্বনি তুলেছে। মুহূর্তে ওই চমকে তার পলক পড়ে যায় চোখে। চোখ

যখন খোলে, তখন চোখের সামনে প্লাটফর্মের লোকারণ্য ফুটে ওঠে। তার দৃষ্টির সন্ধান, অন্ধকারে আলোর ছটার মত ছুটে যায় এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত।

কোথায় রাধা?

রাধে! রাধে! কি কুৎসিৎ মেয়ে! কি তেলচকচকে মুখ, মাথার চুল বাঁধার কি বিশ্রী ভঙ্গি। আরে রাম রাম, পাশ দিয়ে চলে গেল, ছড়িয়ে গেল কি উৎকট গন্ধ!

তালের ফাঁক দেখে বহুবল্লভ কাঁধের গামছা টেনে নাক মুছে নেয়, মাথার গন্ধতেল মাখা চুলে আঙুল ঘষে নিয়ে নাকে বুলিয়ে নেয়।

আঃ হাসছে, কি বিশ্রী দাগ ধরা দাঁত বেরিয়েছে।

রাধে! রাধে!

কোথায় রাধা?

গুরু দেহ রাখলেন, তার কিছু দিনের মধ্যেই বহুবল্লভের ভুল ভেঙে গেল—গুরুর মায়া নিষ্পলক চোখের দৃষ্টি পলক পড়ে কেটে যাওয়ার মত কেটে গেল। বহুবল্লভ দেখলে, কোথায় রাধা!

রাধে! রাধে! কি বিশ্রী কুসুম। ঠিক এই এদের মত। কোন তফাৎ ছিল না এদের সঙ্গে। তবু সে নিজেকে বেঁধেছিল। গুরুর কথা স্মরণ করেছিল। মুখুজ্জে তাকে গান শেখাতে গিয়ে প্রথম শিখিয়েছিলেন ওই গানখানি—

ও আমার মনের রাধায় খুঁজে মরি তিন ভুবনে
রাধা আমার কোথায় থাকে গোলকধাঁধার কোন গোপনে!

গুরুর কাছে বসেছিলেন হেরম্ব ভটচাজ! মস্ত বড় কালীসাধক। তিনি তামাক খাওয়া বন্ধ করে সতীশ মুখুজ্জেকে বলেছিলেন, পেলি? রাধা পেলি? বামুনের ছেলে বোরেগী হ'লি, কচুপোড়া খেলি, তা পেলি সন্ধান?

সতীশ মুখুজ্জে বলেছিলেন, খুঁজতে খুঁজতে মিলবে। এ জন্মে না হয় অন্য জন্মে। হেসেছিলেন।

## ॥ তিন ॥

বিভূতি এ কথা শুনে হা-হা করে হেসে বলেছিল, দূর শালা! তুই কি রে! ভাগ্ ভাগ্! শালা মানুষ হয়ে জন্মেছি—খাই দাই ঘুমুই। বেটাছেলে হয়ে জন্মেছি, মেয়েদের যাকে চোখে ভাল লাগবে তাকে পেলে আলাপ করব, আনন্দ করব, তবে জান বাঁচিয়ে বাবা, মার খেয়ে মরতে পারব না, বাস্। তুমি আমার লগনচাঁদা ভাই, তুমি যে এমনি ক'রে ঘোরো, তাকে ফুল-জল দিয়ে পূজো করে পটের ছবির মতন দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখতে? না? কই, বল নিজের বুকে হাত দিয়ে।

প্রথমটা উত্তর দিতে পারে নাই বহুবল্লভ। কিন্তু কিছুক্ষণ পর স্বীকার করতে হয়েছিল তাকে। বিভূতির কাছেও স্বীকার করেছিল, নিজের কাছেও স্বীকার করেছিল, বিভূতির কথাটাই সত্য। বিভূতি আর তাতে কোথায় তফাত?

বিভূতি বলেছিল, ওরে শালা। লজ্জা হচ্ছে তোমার? কিসের লজ্জা? দূর দূর! লজ্জা-ফজ্জার ধার ধারি না বাবা।

বিভূতি সে কি হাসিই হেসেছিল। মদ খাব তো গায়ে গন্ধ উঠবে, লোকে মাতাল বলবে ভেবে মদ খাব না? মদ খাব, খেয়ে নালাতেই পড়ে থাকব। বলব, হ্যাঁ, মদ খেয়েছি, নালাতে পড়েছি, তুমি না হয় থুতু দাও, না হয় এক লাথি মার। কিন্তু ওতেই যে আমার স্বর্গ-সুখ প্রভু।

বিভূতির হাতে-পায়ের ভঙ্গি এবং মাতালের অভিনয় দেখে বহুবল্লভও প্রাণ খুলে বিভূতির সঙ্গে হাসতে সুরু করেছিল। লজ্জাই যেন দূরে পালিয়েছে সেদিন থেকে।

ওঃ, ছি ছি! রাধে রাধে!

স্টেশনের প্লাটফর্ম থেকে হঠাৎ উঠে পড়ে বহুবল্লভ—না, আজ

আর না। আজ চললাম বাবা। আবার আসব একদিন। কবে তা বলতে পারছি না। আর ভাল লাগছে না বাবা। সারাদিন চেঁচিয়ে পয়সা রোজগার আর ভাল লাগছে না। না, ভাল লাগছে না।

*　　*　　*　　*

বিভূতির সঙ্গে বহুবল্লভের দেখা হয়েছিল সাড়ে চার বছর পর।

গুরু তাকে যাত্রার দল থেকে ছাড়িয়ে নিজের গাঁয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘর করে দিয়েছিলেন। বেঁচেছিলেন তিন বছর। গুরুর দেহরক্ষার পর মাস তিনেকের মধ্যেই বহুবল্লভের কাছে বউ কুসুম ওই মেয়েগুলির মত বিশ্রী হয়ে উঠল। বহুবল্লভকে তখন জীবিকার জন্য ঘুরতে হয় গ্রামে গ্রামে। ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে গাছতলায় বসে চোখ বন্ধ হয়ে আসে, ঝুম ঝুম শব্দ শুনতে পায়, দেখতে পায় রায়বল্লভপুরের আসর, রাধা ঢুকেছে আসরে, পায়ে নূপুর, হাতে কঙ্কন বাজুবন্ধ, গলায় চিক, মাথায় মুকুট। সমস্ত দেহের অনুপরমাণুতে এক অসহনীয় অস্থিরতা জেগে ওঠে। ছুটতে ইচ্ছা হয় উল্কার মত। ক্রোধ জেগে ওঠে অন্তরে অন্তরে। দাঁতে দাঁত ঘষে আপন মনেই।

হঠাৎ দেখা হ'ল কাদম্বিনীর সঙ্গে, কাদুর সঙ্গে।

গঙ্গাস্নানের যোগ। পায়ে হেঁটে যাত্রীদল চলেছে। তরুণী বিধবা মেয়ে হাস্যে লাস্যে দলটিকে কলরবমুখর ক'রে চলেছে।

মুহূর্তে বহুবল্লভের মনে হ'ল, এই তো। একেই তো সে এতদিন কামনা ক'রে এসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল সে। কোন কিছুর কথা মনে হ'ল না। চলল সঙ্গে সঙ্গে।

কাদুই বলেছিল, অ মাগো! তুমি কে গো? সঙ্গ ধরলে যে?

বহুবল্লভ বলেছিল, আমিও গঙ্গা স্নানে যাব।

কাদু তার দিকে তাকিয়ে ভাল করে দেখে শুনে বলেছিল, গান শোনাতে হবে কিন্তু।

বহুবল্লভের হাতের একতারা সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠেছিল—গ্যাঁও গ্যাঁও গ্যাঁও!

গান ধরেছিল—

ও আমার মনের রাধায় খুঁজে মরি তিন ভুবনে!
( গ্যাঁও, গ্যাঁও, গ্যাঁও, গ্যাঁও )
মনের রাধা কোথায় থাকে গোলকধাঁধার কোন্ গোপনে!

স্তব্ধ হয়ে যাত্রীরা পথ চলছিল। কাদুও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কাদুর পাশেই চলছিল বহুবল্লভ। কাদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছিল। গান শেষ হলে কাদু তার দিকে তাকালে। কি মুখ, সে কি দৃষ্টি, মুখরা মেয়েটা যেন এইটুকু সময়ের মধ্যে ঘুমিয়ে গিয়ে স্বপ্ন দেখছে!

এই তো সেই।

না। সে নয়। কাদু আর কুসুমের তফাত নেই। মাস তিনেক না যেতেই বহুবল্লভ বুঝতে পারলে।

গঙ্গাস্নানের ঘাট থেকেই স'রে পড়েছিল ওরা দুজনে। নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে চলে গিয়েছিল অন্য পারে। এক নদী বিশ ক্রোশ।

তিন মাস পর ভুল বুঝে একদিন রাত্রে কাদুকে ফেলে আবার গঙ্গা পার হয়েই ফিরল। ফেরার পথে বিভূতির সঙ্গে দেখা। বিভূতির কাছে সে কেঁদেছিল। বিভূতি হেসেছিল। বিভূতির হাসির ছোঁয়াচে হাসতে হাসতে সহজ মানুষ হয়ে ঘরে ফিরল। ঘরে ফিরে দেখলে কুসুম নেই। চ'লে গেছে, অন্য লোককে সে বৈষ্ণব-ধর্মমতে পত্র করেছে।

বহুবল্লভ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। মনে মনে বললে, ভালই করেছে কুসুম।

মাস ছয়েক পর আবার দেখা হয়ে গেল, একজনের সঙ্গে।

সুবাসীর সঙ্গে।

আট মাস পর সুবাসীকে ছেড়ে দেশে ফিরল বহুবল্লভ।

এবার আর লজ্জা ছিল না তার। লোকের প্রশ্নের জবাব দিলে হাসিমুখে।

হ্যাঁ, তা তীর্থও বলতে পারেন। স্যান, এখন গান শোনেন। গ্যাঁও-গ্যাঁও-গ্যাঁও শব্দে একতারা বাজিয়ে কথা ঢাকা দিয়ে গান ধরে দিল—

ও আমার মনের রাধায় খুঁজে মরি তিন ভুবনে।

## ॥ চার ॥

খুঁজে পাওয়া যাবে না—এই কথাই স্থির জেনেছিল বহুবল্লভ। মনকে শক্ত করে বেঁধে সে এবার হাটচরণপুরের রেল-প্লাটফর্মে বসে আকাশের দিকে চোখ রেখে গান গেয়ে যেতে লাগল; চোখ সে নামাবে না।

হঠাৎ হাসি—খিলখিল হাসির শব্দ কানে এসে ঢুকল। নিখিল ভুবনে কিসের ঝিলিক খেলে গেল। চোখ নামিয়ে বহুবল্লভ অন্তরে অন্তরে কেঁপে উঠল। ও কে? কে? ট্রেনের কামরায়?

ট্রেনখানা ছাড়বে এখুনি।

এই তো।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ঝোলা-ঝাপটা নিয়ে উঠে পড়ে বহুবল্লভ, একেবারে ট্রেনে চড়ে বসে। দেখতে পেয়েছে একজনকে।

স্টেশনমাষ্টারকে বলে, চেকারবাবুকে বলে দেন বাবু, গাড়িতে পয়সা নিয়ে আমাকে টিকিট দিতে।

যাবে কোথা?

এই আসি, একবার ফিরে আসি।

ঝুমুরের দল। আলাপ হতে পাঁচ মিনিট লাগল না। লজ্জাও নাই বহুবল্লভের। এক গাড়ি লোকের সামনেই বলে, চল, তোমাদের সঙ্গেই যাব।

আমাদের সঙ্গে? হেসে উঠল মেয়েটি—বহুবল্লভের রাধা।

হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে।

পাপ হবে না?

নাঃ।

মরণ তোমার বুড়ো বোরেগী!

তোমার হাতে মরণ হলে আমি সগ্‌গে যাব গো।

আমাদের হাতে মরণ ভিখেরী ফকিরের হয় না বুড়ো—মুখ মচকালে মেয়েটি।

হাসলে বহুবল্লভ। কোন উত্তর দিলে না।

মেয়েটির বয়সের চেয়ে বয়স্কা দলনেত্রী মেয়েটিকে বললে, কি সব বকছিস যা-তা?

তাকাচ্ছে দেখ না!—ফিরে বসল মেয়েটি।

একটা বড় জংসন ষ্টেশনে গাড়িটা খালি হয়ে গেল। রইল শুধু ওরা কজন। তাদের মধ্যেও কজন নামল খাবার কিনতে।

নিরালা পেয়ে বহুবল্লভ আপনার কোমরে বাঁধা গেঁজেটা নাড়া দিয়ে বললে, আছে। দেখতে ভিখিরী হলেও ভিখিরী নই।

মেয়েটি ফিরে তাকাল। চোখ ঝল্‌কে উঠল তার।

বহুবল্লভ একতারা বাজাতে লাগল—গ্যাঁও—গ্যাঁও—গ্যাঁও—গ্যাঁও।

গাড়ির ঘণ্টা পড়ল।

দশ দিন না-যেতে বহুবল্লভের মন বললে, না, আর না। দেহব্যবসায়িনী ঝুমুর দলের মেয়েকে বলতে দ্বিধা কিসের? বললে, চলব এবার।

চলবে?—ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে গোলাপ ওর দিকে তাকালে।

হ্যাঁ। ছুটি দাও।

আচ্ছা। আজ নয়, কাল।

কেন?

না।

বহুবল্লভ বিস্মিত হয়ে গেল। সন্ধ্যায় গোলাপ একেবারে মহোৎসব বসিয়ে দিলে। আয়োজন কত। কিন্তু—

কিন্তু মদ তো আমি খাই না।

আমি খাব। তুমি গাইবে, আমি নাচব। আর এ বাজাবে।

দলের বাজিয়েকে নিয়ে এল। গোলাপ বলে, ও আমার ভাই। কিন্তু বহুবল্লভ জানে। হাসলে বহুবল্লভ।

বেশ, তাই। কিন্তু আমি যা গাইব, তার সঙ্গেই নাচতে হবে।

হ্যাঁ, তাই নাচব। গাইবে তো তুমি, মনের রাধা? ধর। তাই ধর।—গোলাপ হটবে না।

গ্লাস পরিপূর্ণ ক'রে নিয়ে মদ খেয়ে গোলাপ পায়ে ঘুঙুর বাঁধলে। তারপর বললে, দাঁড়াও। কি? আমরা মদ খেলাম, তুমি শুধু মুখে আছ? ব'লে সে চ'লে গেল। ফিরে এল শরবৎ নিয়ে। খাও শরবৎ। মাথা খাও আমার।

বহুবল্লভ হেসে শরবৎ খেয়ে বললে, নাও।

গ্যাঁও, গ্যাঁও, গ্যাঁও, গ্যাঁও।

ও আমার মনের রাধায় খুঁজে মরি তিন ভুবনে!

ঝুম ঝুম, ঝুম ঝুম।—বাজতে লাগল গোলাপের পায়ের ঘুঙুর।

হঠাৎ চমকে উঠল বহুবল্লভ। গোলাপ তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। নেশায় পাগল হয়ে গেছে মেয়েটা। রাধে রাধে! রাধা খুঁজতে বেরিয়ে সে এল কোথায়, পড়ল কোথায়? মুহূর্তে মনে হ'ল, কানু, সুবাসী, যাদের মধ্যে সে রাধা খুঁজেছে, তারাও আজ সবাই এই মুহূর্তে ঠিক এমনি ক'রে নেশায় উন্মত্ত হয়ে নাচছে। আঃ, ছি-ছি-ছি!

চীৎকার করে উঠল বহুবল্লভ, আঃ—

নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় সে অভিভূত হয়ে গেল। আঃ—

চোখ মুদলে। কিন্তু পর-মুহূর্তেই আবার চোখ খুললে। সব যেন কেমন থরথর করে কাঁপছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

ওঠ্, উঠে পড়্। কি হ'ল, রক্ত তোর সর্বাঙ্গে?

দাঁড়া। গেঁজলেটা খুলে নিই।

গোলাপ ঝুঁকে পড়ল। উত্তেজিত মত্ত হাত কাঁপছে গোলাপের, হাতের কাচের চুড়ি ঝিনঝিন শব্দে বাজছে। পা দুটো ঠকঠক করে কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুঙুরের মৃদু শব্দ হচ্ছে।

বহুবল্লভ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে। এ কি? রাধার পায়ের নূপুর বাজছে! কঙ্কনের শব্দ উঠছে! রাধা আসছে! রাধা! রাধা!

গোলাপ উঠে দাঁড়াল। বহুবল্লভের চোখের দিকে চেয়ে আতঙ্কিত হয়ে আবার ব'সে পড়ে দুই হাত চেপে চোখের পাতা দুটো নামিয়ে দিল। পিঠে ছোরা মেরেছিল বাজিয়ে, সেই ছোরাখানাকে টেনে বের ক'রে বসিয়ে দিলে বুকে।

রাধা এসেছে। বহুবল্লভের সমস্ত দেহটা নিষ্ঠুর আক্ষেপে একবার ঝাঁকি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

# বিষপাথর

একটা পাথরে ঠোক্কর খেয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরে গেল রমন ঘোষের চোখের সামনে। বসে পড়ল বেচারী। জুতো থেকে পা বের করে বুড়ো আঙুল ধরে খানিকক্ষণ বসে থাকতে হল। পায়ের ব্যথাটা কমতেই অকস্মাৎ রাগ হয়ে উঠল পাথরটার উপর। এবং পঁয়ষট্টি বছরের বৃদ্ধ রমন ঘোষ হাতের লাঠিটা দিয়ে পাথরটাকে খুঁচতে লাগল—এঁই! এঁই! এঁই! শা—! কিন্তু পাথরটা উঠল না। যেন কায়েমী স্বত্বে মোকররী মৌরুসীদারের মত পোক্ত হয়ে নিজেকে গেড়ে রেখেছে এখানে। অবশ্য সবদিক বিবেচনা করলে অন্যায়টা পাথরটার, না অন্যায় রমন ঘোষের সে কথা বলা শক্ত। মানুষের পায়ে-চলা পথের মধ্যে পাথরটা বসে ছিল না। একেবারে পাথরের নুড়ি ছড়ানো বীরভূমের লাল মাটির 'ডাঙা', অর্থাৎ তৃণহীন প্রান্তর। গরু ছাগল পর্যন্ত হাঁটে না। ঘাস জন্মায় না, যাবে কিসের জন্য? সাপ ব্যাঙও থাকে না, জলহীন লাল মাটি গ্রীষ্মে যত উত্তপ্ত হয়—শীতে তত ঠাণ্ডা হয়। খালি পায়ের দেশ—মানুষ হাঁটে না—নুড়িগুলো পায়ে বেঁধে; রমন ঘোষের মত ঠোক্কর খেতে হয়। যে যুগে দুনিয়া জুড়ে এক-একটা এলাকা নিয়ে নানান 'স্তান' বা 'স্থান' গঠনের দাবী উঠেছে, সে যুগে নুড়িগুলোর ভাষা থাকলে অবশ্যম্ভাবীরূপে—এলাকায় পা দেবার আগেই রমন ঘোষ শুনতে পেত—খবরদার এ আমাদের 'নুড়িস্তান'! হুঁচোট দেঙ্গে, রক্ত লেঙ্গে—কায়েম করেঙ্গে নুড়িস্তান! অন্যায়টা

রমন ঘোষের। কিন্তু রমন ঘোষ দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়েই প্রায়—দুর্গম হলেও—এই সুড়িস্তান দিয়ে চলেছিল। বার বার সে আপন মনেই বলছিল—'গলায় কলসী বেঁধে জলে ঝাঁপ দেব। ঘরে আগুন দিয়ে চলে যাব। করব কি? বেঁচে হবে কি? সব যাবে তাই ড্যাব ড্যাব করে চোখ চেয়ে দেখব? উচ্ছন্ন যাক; ধ্বংস হোক।'

রমন ঘোষ আগেকার কালের মহাজন জোতদারদের জাতের অবশিষ্ট স্বল্পসংখ্যকদের একজন। ফজলুল হক সাহেবের ঋণসালিসী বোর্ড প্রবর্তন থেকে শুরু করে জমিদারী, জোতদারী, মহাজনী-সমৃদ্ধ সমাজের উপর যে প্রাগৈতিহাসিক আমলের হিমানী ঝড় ব'য়ে চলেছে, তাতে অতিকায় জন্তুর মত এদের সংখ্যা কমে আসছে; যারা আছে, তাদের মধ্যে রমন ঘোষ বিচক্ষণ বলেই বেঁচে আছে। কিন্তু এবার এসেছে প্রলয় ঝড়। জমিদারী উচ্ছেদ আইন, তারপর এই জমির নতুন ব্যবস্থার খামখেয়ালী আইন। তিরিশ বিঘের বেশী আবাদী জমি থাকবে না কারুর। পতিত পুকুর নিয়ে পঁচাত্তর বিঘে। এর পর আর রমন ঘোষ বাঁচে না—বাঁচতে হয়? না ঘরে থাকতে হয়! আর যারা এই আইন করছে, তারা উচ্ছন্ন যাবে না? ভগবান এই সইবেন! বিচার করবেন না?

সারা জীবন ধরে রমন ঘোষ একটি একটি করে পয়সা জমিয়েছে। পয়সা থেকে টাকা, টাকা থেকে নোট—নোট থেকে হ্যাণ্ডনোট—তা থেকে সুদে-আসলে তমসুখ। শেষের দিকে কট্‌-কবলা। অন্য দিকে থালা বাসন থেকে আরম্ভ করে সোনা-রুপোর গহনার মেয়াদী বন্ধকী কারবার। তার থেকে অঞ্চল জুড়ে জমি। পাঁচশো আটাশ বিঘে আবাদী জমি। ভাগে, ঠিকে, কোর্ফায় বিলি। পৌষ মাসে খামার জুড়ে বাখার গোলা গড়ে ওঠে; পরিপূর্ণ ধান। সেই ধান বর্ষায় বাড়ি-সুদে চাষীরা ভদ্রলোকেরা নিয়ে যায়। মা-লক্ষ্মী চেঞ্জে যান—দেড়া হয়ে শরীর সেরে ফিরে

আসেন। সে সব গেল, সব গেল, সব গেল! এতে আর বাঁচতে হয়!

পৌষ মাস, রমন ঘোষ দু' ক্রোশ দূরে গোয়ালপাড়ায় এই জমির ধানের তাগাদায় গিয়েছিল। গোয়ালপাড়ায় চল্লিশ বিঘে জমি রমন ঘোষের। সব ভাগে, ঠিকেও বিলি আছে। অন্যবার তারা মাথায় করে ধান দিয়ে যায়, এবার কেউ উঁকি মারেনি। তাগাদা করবার জন্য হেফাজুদ্দি শেখ আছে। তারই বয়সী হেফাজুদ্দি; পায়ে বাত হয়েছে; তাগাদায় হেঁটে হেঁটে তার বাত সেরে গেল, কিন্তু ধান্ এল না। হেফাজুদ্দি বলে—'ইয়াদের গতিকগাতিক ভাল লয় ঘোষ। নিত্যিকালের মরণ নাই—তা কাল তাকাত বলে না ব্যাটারা, বলে দু'চার দিনেই যাব। বুঝ না—ই দু'চার দিন হতে হতে তুমিও কাবার, আমিও কাবার।'

—'কাবার?' খিঁচিয়ে ওঠে রমন—'কাবার? আমি সব সাবাড় করে দিয়ে যাব তার আগে। হুঁ।'

সেই সাবাড় করবার জন্যই আজ নিজে বেরিয়েছিল ঘোষ। কাবারের সঙ্গে সাবাড় কথাটা বেশ মেলে বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাবাড়ের অর্থটা কি, তা তার কাছেও পরিষ্কার নয়। হেফাজুদ্দি ক'দিন থেকে দশ মাইল দূরের একটা গাঁয়ে গিয়েছে। সেখানে নিজের একটা খামারই আছে ঘোষের। কিছু লোক সেখানে খামারে ধান তুলছে—সে ধানগুলি ঝাড়া হবে। হেফাজুদ্দি ছাড়া যাবার লোক নেই। স্ত্রী পুত্র কন্যা কেউ নেই, থাকবার মধ্যে এক বালবিধবা নিঃসন্তান বোন—আর দুই অপগণ্ড দৌহিত্র। কড়ি আর ঝড়ি। কড়িকে আঁতুড়ে কড়া দিয়ে দাইয়ের কাছ থেকে বা যমের কাছ থেকে নিতে হয়েছিল, তাই কড়ি। আর কাবারের সঙ্গে মিল রেখে অর্থহীন সাবাড়ের মত কড়ির ভাই ঝড়ি। ও হিসেবে দাড়ি হতে পারত, দড়ি হতে পারত, ঘড়ি হতে পারত, ড়ি-কারান্ত অনেক কিছু হতে পারত—কিন্তু ঝড়ি ছাড়া আর

কিছু মনে পড়েনি। একমাত্র মেয়ে নাম রেখেছিল—লক্ষ্মী। আর ছেলেপুলে না হওয়ায় একটি গরীবের ছেলে দেখে বিয়ে দিয়ে ঘরে রেখেছিল। হারামজাদা, নেমখারাম; শুয়ারের বাচ্চা! ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আঠার বছর ভিজে বেড়ালের মত কাটিয়ে রমন ঘোষের টাকা পোঁতা মেঝের উপর তুলোর তোষকে শুয়ে গরমে বেটা দিন কতকের মধ্যেই শুকনো লোম বনবেড়াল—তারপর ক্রমে হল গুলবাঘ। যে বেটা বিড়ি খেত না—সে বেটা রমন ঘোষের জামাই হয়ে ধরলে সিগারেট—তার সঙ্গে মদ। রমন ঘোষ নামে রাধারমণ হলেও বাঁশী নিয়ে কারবার কোনদিন করে না—তার হাতের এই বংশদণ্ডটি—এটিকে সে চিরকাল বলে বংশ খেঁটে—এই নিয়েই তার কারবার—এই খেঁটে নিয়ে তাড়া করত জামাইকে—নিকালো। আভি, আভি! নেহি মাংতা হ্যায়! দিন কতক বেটা ভয় করেছিল—তারপর ফ্যাঁস ফ্যাঁস শুরু করে শেষ পর্যন্ত গর্জন করে বলেছিল—তুম নেহি মাংতা—নেহি মাংতা। আভি নিকালে গা। ঠিক হ্যায়; লেকেন হাম হামারা পরিবার বেট্টা মাংতা হ্যায়। দাও বাহার করকে। লেকেন হাম চলা যায়েগা। তুম শ্বশুর নেহি হ্যায়, তুম অসুর হ্যায়।

রমন ঘোষ হতবাক হয়ে গিয়েছিল। শ্বশুরের সঙ্গে অসুরের মত জামাইয়ের সঙ্গে মিল করে লাগসই জুতসই একটি কথাও সে তার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে খুঁজে পায় নি। শেষ পর্যন্ত লাঠি নিয়ে মারতে ছুটেছিল। একদিন মেরেও বসেছিল। এবং তার ফলে নেশা ছোটার পর জামাই, লক্ষ্মী এবং এক বছরের কড়িকে নিয়ে চলে গিয়েছিল। রমন বার বার বারণ করেছিল মেয়েকে—'যাবিনে খবরদার, যাবিনে লক্ষ্মী।' কিন্তু লক্ষ্মী শোনে নি। রমন বলেছিল—'তা হলে জন্মের মত যা।' তাই গেল। বছর চারেক পর ওই ঝড়িকে প্রসব করে—সূতিকা ধরিয়ে মাস কয়েক ভুগে খালাস পেলে। বেটারছেলে মরবার একদিন আগে একটা খবর দিয়েছিল শুধু;

তার আগে ঘুণাক্ষরেও জানায় নি। রমন ঘোষ যখন গেল, তখন প্রায় শেষ। ঘণ্টা দুয়েক পরই মারা গিয়েছিল লক্ষ্মী। হারামজাদা ছোটলোকের বাচ্চা গুণের সাগর। শ্রাদ্ধশান্তিটা চুকবামাত্র একদা রাত্রে উধাও। চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল—'আমি সন্ন্যাসী হইলাম।' ক্যাঁকলাসের মত চেহারা সাড়ে পাঁচ বছরের কড়ি আর মাস কয়েকের কাঁটাসার ঝড়িকে নিয়ে অগত্যা স্বামী-স্ত্রীতে ফিরে এসেছিল রমন ঘোষ। এরই এক বছরের মধ্যে মারা গেল রমনের স্ত্রী। আপদ গেল। মেয়ের জন্যে পাঁচ বছর ধরেই কাঁদত গুনগুনিয়ে। মেয়ে মরতেই চেঁচিয়ে বিনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে শয্যা নিলে—তারপর মরল। আপদ গেল। দিনরাত্রি ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান ঘ্যান আর ভাল লাগছিল না। ছেলে দুটোকে তুলে নিলে মানদা—বিধবা বোন। তাগড়া শক্ত চেহারা, তেমনি গতর, তেমনি সহ্যগুণ। রমন ঘোষ গাল দিলে মানদা হাসে। রমন চিরদিনই মানদাকে গাল দিয়ে আসছে। সেই ছেলেবেলা থেকে। সেই সময় একদিন রমন মানদার হাসি দেখে বলেছিল, 'গাল খেয়ে হাসি? তুই মর! তুই মর!'

মানদা বলেছিল—'তুমি একটি বিয়ে কর আমি দেখে মরি!'

—'বিয়ে করব?' কটমট করে তাকিয়ে ছিল রমন—'বিয়ে? বিয়ে করব?'

—'হ্যাঁ। এই ধন-সম্পত্তি—'

কথার মাঝখানে রমন বলেছিল—'তার চেয়ে রোগে ধরুক আমাকে। চিররোগী হয়ে পড়ে থাকি!'

—'মা-গো!' অবাক হয়ে গিয়েছিল মানদা।—'বিয়ের এত অপরাধ?'

—এর চেয়ে বেশী অপরাধ। রোগের চেয়ে অনেক বেশী। চিররোগে ধরলে সেও ছাড়ে না, বিয়ে করলে বউ ছাড়ে না। রোগ ওষুধে বাগ মানে, বউ কিছুতেই বাগ মানে না। রোগের পথ্যি-ওষুধের

দামের চেয়ে, বউয়ের খোরাক-পোশাকে বেশী খরচ। রোগ ছাড়লে আরাম হয়, বউ মরলে ছেলের জ্বালা রেখে যায়; ছেলে মরলে নাতি থাকে। রোগে মরলে রোগ সঙ্গে যায়—বউ সঙ্গে মরে না—বউ থাকে। বিধবা হয়ে খাওয়ার তরিবৎ বাড়ে—মোটা হয়। ঝাড়ু মার বিয়ের মুখে। বিয়ে! বিয়ের ফল ওই দেখ—দুই কঁ্যাকলাস। এক কঁ্যাকলাস গায়ে পড়লে ছ' মাসের বেশী বাঁচে না। এ দুই কঁ্যাকলাস। কবে মরি তার ঠিক নাই, আবার বিয়ে!

নাতিরা সেই কঁ্যাকলাস। চেহারা অবশ্য আর কঁ্যাকলাসের মত নাই; পেট পুরে খেয়ে আর মানদার যত্নে হারামজাদের বেটা হারামজাদ দুটো মহীরাবণের বেটা জোড়া অহিরাবণ হয়ে উঠেছে। বড় কড়িটা তো রীতিমত ষণ্ডা এবং ষণ্ড দুই-ই হয়ে উঠেছে। হারামজাদ আবার 'ডন-বৈঠ্কী' করে। হাতের গুলগুলো লোহার গোলার মত শক্ত করে তুলেছে। বুকের ছাতি—সে এই এতখানি; মধ্যে মধ্যে মাপ করে; আটত্রিশ ইঞ্চি থেকে সাড়ে সাঁইত্রিশ ইঞ্চি হলে হারামজাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। ডন-বৈঠ্কী বাড়ায়। আর মানদা বাড়ায় দুধ, ছোলা, রুটি, মাছ।

মানদা সর্বনাশীকে কিছু বলবার জো নেই; সর্বনাশী ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়ে এ বাড়ীতে যখন আসে, তখন স্বামীর কিছু টাকা নিয়ে এসেছিল। আর ছিল গহনা। দুইয়ে জড়িয়ে তখনকার দিনের হাজার দেড়েক। তাই নিয়ে নিজের কারবার আছে সর্বনাশীর। বাজে কারবার; মাথায় বুদ্ধি বলতে একবিন্দু নাই। বেছে বেছে লোকসানী খাতককে টাকা ধার দেয়। তাও না কিছু বন্ধক, না কোন লেখাপড়া। কার কোথায় অসুখে চিকিৎসা হয় না, মানদা গিয়ে টাকা দিয়ে আসবে। যা হয় সুদ দিয়ো;

আমি তো বিধবা মানুষ। সুদ না পায় আসলটা ডুবিয়ো না। কার মেয়ের বিয়ের টাকা হচ্ছে না। গিয়ে বললে—এই নাও ক্রমে ক্রমে দিয়ো। মেয়ের বিয়ে তো হোক। আশ্চর্য, এ সত্ত্বেও টাকাটা ওর ডোবে নাই, রামনাম করে বাঁদরের ভাসানো পাথরের চাঁইয়ের মত জলের উপর ভেসেই রইল। শুধু রইল নয়—তার উপর ঘাস ফসল ফলানো ক্ষেত হয়ে উঠল। এ ছাড়া মানদার কিছু জমিও আছে। তার ধানের আয়টাও বছর বছর আসে। ওই সবের আয় থেকে ছোঁড়া দুটোর ভাল-মন্দর ব্যবস্থা হয়। অবশ্য তাকেও দেয় মানদা। কি করবে রমন ঘোষ, অপচয় হতে দিতে তো পারে না, সে না খেলে পাড়াপড়শীকে বিলোবে সর্বনাশী। চারটে গাই; এক একটা দুধ দেয় চার সের। দুটো গাই দুধ দেয়; এ দুটো ছাড়াতে ছাড়াতে ও দুটোর বাচ্চা হয়। আট সের দুধ। না খেয়ে করে কি ঘোষ। আবার সর জমিয়ে ঘি করে। দুধে-ঘিয়ে ছোলায় রুটিতে ক্যাঁকলাস দুটো ষাঁড় হয়ে উঠেছে। কড়িটা দিনরাত্রি গুলপাকায় আর গোঁ গোঁ করে। রমন ঘোষের ভয় হয় কোনদিন না গুঁতিয়ে বসে।

ছোট ঝড়িটা আবার অন্য রকমের। ওটা ষাঁড় হলেও বসোয়া—মানে শিবের বাহন ষাঁড়ের জাত। রঙচঙে কাপড় দিয়ে সাজিয়ে, পিতলে শিং বাঁধিয়ে, পিঠে আর একটা পা-ওয়ালা যে ষাঁড়গুলোকে নিয়ে হা'ঘরেগুলো ভিক্ষে করে বেড়ায়, সেই জাত। বারো তের বছরের ঝড়ি আজ এ-ঠাকুর গড়ছে, কাল ও-ঠাকুর গড়ছে, গাছতলায় বসিয়ে পূজো করছে, টিন বাজাচ্ছে, শালুক ডাঁটি বলি দিচ্ছে। সন্ধ্যায় করতাল বাজিয়ে আবার হরিনাম করে। তবে ছোঁড়াটা পড়ে। মানদা ওকে নিমাই নিমাই করে এক ক্ষুদে গৌরাঙ্গ বানিয়ে তুলছে।

এই সংসারের অবস্থা। এতে রমন ঘোষের সাহায্যই বা কি হবে—সুবিধেই বা কোথায়। একমাত্র সে মরার পর চাল কলা

তিল মধু মেখে তুলসীপাতা দিয়ে গয়াগঙ্গা বারাণসী বিষ্ণুপদে হরি বলে পিণ্ডি দেওয়া ছাড়া ওদের কাছে কোন প্রত্যাশা রমন ঘোষের নাই।

না-থাক, রমন ঘোষ কারুর তোয়াক্কা করে না। সে কাউকে কিছু দিয়ে যাবে না। কিচ্ছু না। যা ওই জমি-জেরাত থাকবে তাই পাবি পিণ্ডি দিয়ে। আসল যা—নগদ সে ঐ মাটির তলায় পুঁতে রেখে যাবে। হাঁ।

এক এক সময় মনে হয়—একদিন কাউকে কিছু না বলে ওই সব নগদ সঞ্চয় তুলে কাছায় কোঁচায় ট্যাঁকে বেঁধে সরে পড়বে। যেখানে খুশী গিয়ে খুব করে কিছুদিন কাটিয়ে দেবে। কিন্তু তা পারে না, ভয় হয়। মনটাও খুঁতখুত করে।

যাক—যাক, মরুক—; ষণ্ড হয়ে বাঁচুক—গৌর হয়ে বাঁচুক—তার কোন ক্ষতি নাই। রমন ঘোষ এখনও রমন ঘোষ। একাই একশো। পঁয়ষট্টী বছর বয়সেও নধর দেহ, চকচকে চামড়া, মুখে খাঁজ পড়ে নাই। এখনও ব্রহ্মাণ্ড মেরে আসতে পারে। সেই মনের জোরেই সে গিয়েছিল আজ গোয়ালপাড়া। কি ভেবেছে ব্যাটারা? ধান দিবে কি দিবে না? রমন ঘোষের চোখ দুটি গোল। সেই গোল চোখ পাকিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

তাও দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তারা তার পাকানো গোল চোখের সামনেই বলে দিয়েছে—লাঙল যার জমি তার!

সে বলার ভঙ্গি কি? রমন ঘোষের বুকের ভিতরটা ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করে উঠেছে। কে একজন চেঁচিয়ে বলেছে—লাঙল যার—

বাকী লোক সমস্বরে হরিবোল দেওয়ার মত বলে উঠেছে—জমি তার!

তারপর আবার—রমন ঘোষ—

—বাড়ি যাও।

—ইনকিলাব—

—জিন্দাবাদ!

ভয়ে পালিয়ে এসেছে রমন ঘোষ। যাক বাবা ওই পর্যন্ত থাক। চীৎকার করেই ক্ষান্ত দে। গ্রাম থেকে বেরিয়ে খানিকটা এসে—বার কয়েক পিছনের দিকে তাকিয়ে কেউ আসছে না দেখে তার রাগ হতে আরম্ভ হল। গাল দিতে আরম্ভ করলে ঈশ্বর থেকে গভর্নমেণ্ট পর্যন্ত। হারামজাদ জোতদার থেকে কড়ি ঝড়ি মানদা পর্যন্ত। এবং বাড়ী গিয়েই এর বিহিতের জন্যে সদরে যাবার ব্যবস্থা করবে সংকল্প করে—এই ডাঙায় ডাঙায়—নুড়ি পাথরের রাজ্যের উপর দিয়েই হনহন করে চলেছিল। এক একজনের নামে তিন তিন নম্বর। বাকী ধানের জন্য এক নম্বর, জমি থেকে উচ্ছেদের জন্য নম্বর দুই, আর ওই নাকের কাছে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বলে চেঁচিয়ে ভয় দেখানোর জন্যে ফৌজদারি নম্বর তিন।

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই এই পাথরটায় ঠোকর লেগে বুড়ো আঙুলের মাথা থেকে দেহের মাথা পর্যন্ত ঝন্‌ঝন্ করে উঠে—চোখের সামনে পাথুরে ডাঙাটা পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল এবং মনশ্চক্ষের সামনে ধানপান ক্ষেতখামার সব পাক খেয়েই ক্ষান্ত হল না, মিলিয়ে যেতে লাগল অসীম শূন্যে। অসীম শূন্য—তিনটে শূন্য হয়ে—লাফাতে লাগল। অর্থাৎ তিন শূন্য।

মাথাটা একটু সুস্থ হতেই, যন্ত্রণা কমতেই, নিদারুণ ক্রোধে লাঠি দিয়ে পাথরটাকে খুঁচতে লাগল। কিছুতেই ওঠে না পাথরটা। কিন্তু সেও রমন ঘোষ। পাথরটাকে খুঁচে তুলে তার উপর লাঠি দিয়ে গোটা কয়েক ঘা মেরে তবে ক্ষান্ত হল এবং রওনা হল। না—। কিন্তু ওরে বাবা! খচ করে গোড়ালিতে যেন ছুঁচ বিঁধে গেল। ওঃ!

ছুঁচ নয়, কিন্তু ছুঁচের মাসতুত ভাই অনায়াসে বলা চলে। লোহার কাঁটা। একেবারে প্যাঁক করে বিঁধে গেছে। ডগায় ঠোক্কর খেয়ে

গোড়ালিতে পেরেক উঠে গেছে। কড়ির পুরানো জুতো। কড়ি ফেলে দেয় রমন ঘোষ নিজের হাতেই পেরেক-টেরেক ঠুকে নিয়ে পায়ে দেয়। ছিঁড়ে গেলে—কদরু জুতো-সেলাইকে ডেকে বয়েকা সেলায়ের মত মোটা সেলাই করিয়ে নেয়। দরদস্তুর করে যা হয় সেটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মিটিয়ে দেয় রমন ঘোষ। ওই গুণটি রমনের আছে। যে যা পাবে সেটি সে তৎক্ষণাৎ দেবে। সে জমির খাজনা ট্যাক্স থেকে শুরু করে জিনিসের দাম পর্যন্ত। কদরুকেও দেয়, তবে কড়ার থাকে তিন মাসের মধ্যে ওই জায়গাটাই খারাপ হলে বিনি পয়সায় মেরামত করে দিতে হবে। কদরুর কড়ার আছে, সেলাইয়ের ঘষটে ফোস্কা উঠলে কি পা কাটলে সে জানে না। এ পেরেকটা কিন্তু কদরুর ঠোকা নয়, নিজের ঠোকা। বেটা ঠেলে উঠেছে একেবারে সোজা হয়ে।

আবার একবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর ক্রোধটা ঘুরে এসে পড়ল ওই পাথরটার উপর। ওইটে। ওইটেই সব অনিষ্টের মূল। বেটা কায়েমী মোকররীর স্বত্ব; রাধে রাধে রাধে মোকররীর স্বত্ব হয় ওই বেটা পাথরের? বেটা ভাগ-জোতদার! বেটা তুচ্ছ ভাগ-জোতদার মাথা ঠেলে খুঁটি গেড়ে বসবে তুমি। প্রতিশোধে বেটাকে উচ্ছেদ করেছে সে—এইবার ওর মুণ্ডপাত করবে। ওই বেটাকে দিয়েই ঠুকবে এই পেরেক হারামজাদকে। পাথরটাকে কুড়িয়ে নিলে রমন ঘোষ, তারপর জুতোটাকে আর একটা পাথরের উপর রেখে কাঁটার উপর পাথরটা ঠুকতে লাগল। শা—! শা—! শা—!

ওরে বাপরে! এ যে সর্বনেশে পাথর! ফরফর করে আগুনের ফুল্‌কি ছুটছে! আশ্চর্য। পেরেক ঠুকবার সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কাকাণ্ডের যোগাড়। চারিদিকে আগুনের কণা ছুটছে। একি হনুমানের খ'সে পড়া লেজের গাঁট নাকি? অসুরের কাঁড়ি মানে অসুরের পাথর হওয়া হাড় এখানে অনেক। তখন হনুমানের খসা লেজের টুকরো থাকবে তাতে আশ্চর্য কি?

পেয়েকটা বসিয়ে পাথরটা হাতে নিয়ে বেশ করে দেখলে রমন ঘোষ। হুঁ—বেশ গোলগাল। পোয়াখানেক ওজন হবে। পেয়েকের ঠোকায় একটু একটু দাগ হয়েছে চকচকে সাদা। ওপরটা লাল হয়ে আছে। শা—। তোমার অনেক গুণ। আগুন অনেক তোমার মধ্যে। চকমকিতে এক ঠোক্করে শোলা ধরবে। সারাজীবন আর দেশলাই লাগবে না।

ঘোষ এখনো চকমকি ঠোকে।

কড়িটা যত দেশলাই ফুরুচ্ছে, ঘোষ তত আক্রোশের সঙ্গে চকমকি আঁকড়ে ধরছে। থাক তুমি থাক বেটা পাথর পকেটে থাক। উঁহু—জামাটা অনেক দিনের ছিঁড়ে যাবে। হাতেই থাক। চল—সারা জীবন তোমাকে ঠুকে আগুন বার করব। চল।

## ॥ দুই ॥

সর্বনেশে পাথর। আগুনে পাথর। পাথর থেকে আগুন লাগল।

বাড়ির এঁটোকাঁটা ঘুচোয় যে ঝিটা—সে তারস্বরে চীৎকার করে উঠল—আগুন গো আগুন। লাগল গো লাগল।

রমন ঘোষ ঘরে ব'সে গোবিন্দকে ডাকছিল কাতরস্বরে—এই অকৃতজ্ঞ ধর্মহীন পৃথিবী থেকে পার করবার প্রার্থনা জানাচ্ছিল আর ভাগ-জোতদারদের নামে নালিশের আর্জির খসড়া তৈরি করছিল। পার হবার আগে এস্পার-ওস্পার করে যাবে একটা। হাইকোর্ট পর্যন্ত চল হারামজাদরা!

চীৎকার শুনে চমকে উঠল। আগুন! এই পৌষ মাসের শেষ—খামারে ঐরাবতের মত অতিকায় আপেটা ধান। আগুন লাগলে—খৈই ছড়িয়ে গোটা গ্রাম ছেয়ে দেবে। আগুন! কোথা

থেকে লাগল আগুন! কে লাগালে আগুন? কি করে লাগল আগুন?

স্খলিত কচ্ছ হয়ে কাপড়ের কসি গুঁজতে গুঁজতে বেরিয়ে এল ঘোষ। কোথায় আগুন?

মানদা বললে—নিভে গেছে সে। কিছু না, তুমি আপনার কাজ করগে!

—নিভে গেছে? তা হলে লেগেছিল? কি করে লাগল? কই কোথায় লেগেছিল? কোথায়? এই—এই হারামজাদী—কোথায় লেগেছিল? চেঁচালি যে?

ঝিটা বললে—খড় জ্বেলে যজ্ঞি করছিল নিমু—

নিমু? মানদার কলির পেল্লাদ? খুদে গৌর? যজ্ঞি? কিসের যজ্ঞি? নিজের মারণ যজ্ঞি? না মানদার চিতে? না—আমার ধ্বংস যজ্ঞি? সে কই, সে কোথায়?

পালিয়েছে বাবা। দপ করে খড় জ্বলেছে—আর আমি চেঁচিয়ে উঠেছি আর সে উঠে চোঁচা দৌড়। দিদি এসে জল ঢেলে দিলে এক বালতি। নিভে গেল। একটা পাথর নিয়ে পূজো করছিল। পাথর বাবা, সত্যি ঠাকুর। লণ্ঠন জ্বেলে পাথরটি রেখে পুজো করছে—পাথর জ্বলছে বাবা। ওই দেখ!

সত্যই জ্বলছে।

ভিতর বাড়ি এবং বাইরের খামার বাড়ির মধ্যে খানিকটা ফালি জায়গা। সেখানে একটা কামিনী গাছের তলায় কলির প্রহ্লাদের সাধনপীঠ। হারামজাদের পাঁচপুরুষের পঞ্চমুণ্ডির আসন। যত পূজো ওইখানে হয়। সেখানেই লণ্ঠনের সামনে একটা গোলালো পাথর। সেটা জ্বলছে। ঠিক জ্বলছে। চারিপাশে তার ছটা ছড়িয়ে পড়েছে। আশ্চর্য এ কখনও দেখেনি রমন ঘোষ। তার মুখের কথা হারিয়ে গেল। সে যেন বোবা হয়ে গেছে। এ কি? এ পাথর কোথায় পেলে ঝড়ি? ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে পাথরটা

তুলে নিলে রমন ঘোষ। আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দেখলে। চোখে এসে ছটা লাগছে! পাথরের ভিতরটায় যেন আলো জ্বলছে। আলো নয়—আলো লালচে, এ সাদা। সূর্যের আলোর মত সাদা। চোখ ধেঁধে যাচ্ছে!

পাথরটা, সেই পাথরটা। হ্যাঁ, সেইটাই। ঘোষ এনে রেখে দিয়েছিল তামাক টিকের সঙ্গে ঘরের কোণে; ঠাকুর-পাগলা ঝড়ি ওটার গোলালো আকার দেখে হয় শালগ্রাম নয় শিব যা হয় একটা কিছু হিসেবে পূজো করবে বলে ওটাকে ধুয়ে পরিষ্কার করে কামিনী গাছতলায় কখন স্থাপন করেছে।

জয় ভগবান, সর্বশক্তিমান্! তুমি যা কর মঙ্গলের জন্য। তুমি যা কর মঙ্গলের জন্য। ভাগজোতদারদের দুর্মতি তুমি দিয়েছ, না দিলে তারা ভাগ দেবে না রব তুলত না। ঘোষ যেত না গোয়ালপাড়া। ওরা ইনকিলাব বলে না-চেঁচালে রাগ হত না ঘোষের। রাগ না হলে ওই পাথুরে ডাঙ্গার উপর দিয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে হাঁটত না। ওভাবে পথ না হাঁটলে হোঁচট খেত না ঘোষ। হোঁচট না খেলে পেরেক উঠত না জুতোতে, পেরেক না উঠলে ঘোষ লাঠি দিয়ে খুঁচে পাথরটা তুলত না। জয় ভগবান!

—ওটা কি দাদা? হীরে-টীরে নাকি? এমন জ্বলছে?

—হীরে, হীরে! টীরে নয়! বললে মুখ ভেঙ্গে দোব! হীরে। হীরে। হীরে। প্রায় চীৎকার করে উঠল রমন ঘোষ।

—দেখি! দেখি!

কড়ি কখন এসে দাঁড়িয়েছে ঘোষের পিছনে। ঘোষ জানতে পারে নি। কড়ির গায়ের সিগারেটের গন্ধ নাকে আসা সত্ত্বেও জানতে পারে নি। কড়ির হাতখানা কাঁধের পাশ দিয়ে এগিয়ে আসাতে খেয়াল হয়েছে নইলে বোধ করি কথার আওয়াজেও খেয়াল হত না। ঘোষ স্থূল বপুখানা নিয়েও প্রায় লাফ দিয়ে সরে দাঁড়াল।

—না। ওইখান থেকে দেখ। ওইখান থেকে!

—কেন আমি খেয়ে ফেলব নাকি?

—কি করবি তা জানি না। ওইখান থেকে দেখ।

—তাইতো বেশতো ছটা বের হচ্ছে। ভিতরটায় যেন কি রয়েছে—?

—রয়েছে তো রয়েছে। তোদের কি? তোদের—।

হঠাৎ থেমে গেল রমন ঘোষ। কথা বলতে বলতেই মনে পড়ে গিয়েছে—হীরেতে কাচ কাটে। হীরেতে কাচ কাটে। ঘরে একখানা ছবি আছে। রাধাগোবিন্দের ছবি। তাতে কাচ আছে। হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে।

হন হন করে চলে এল ঘোষ। ঘরে এসে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিলে। জানালাগুলো শীতের দিনে আগে থেকেই বন্ধ ছিল। অনেক কষ্টে তক্তাটা টেনে ও দেওয়ালের ধার থেকে হড়হড় শব্দে টেনে এ দেওয়ালের ধারে এনে লাগিয়ে ছবিখানাকে নামালে। ঘোষের ইষ্ট দেবতার ছবি। যুগলমূর্তির পায়ে কাচের উপর অনেক চন্দন। সব নখ দিয়ে চেঁচে ফেললে। তারপর কাচখানাকে খুলে ফেললে। ক্ষমা করো রাধাগোবিন্দ! হে রাধাশ্যাম! তোমার কাচ কেটে যদি পাথরটা হীরে হয়, তা হলে কাচ নয় বাবা কাঞ্চন, সোনার সিংহাসন করে বসাব তোমাকে। ননী-ছানার ভোগ দোব দু' বেলা। জয় রাধাশ্যাম—কাটিস—কচকচ করে কাচ কাটিস।

কর-র শব্দে দাগ একটা টানলে ঘোষ। পাথরটার একটা খোঁচার মত অংশটা কাচটার উপর রেখে চেপে ধরে মারলে টান। কর-র শব্দ উঠল। হ্যাঁ দাগ পড়েছে, কেটে বসে দাগ কেটেছে। এইবার দুই ধার ধরে চাপ দিলে ঘোষ। মট করে শব্দ হল—যেন ময়রাদের পাটার উপর ঢালা জমানো গুড়ের পাটালি খন্তার দাগ বরাবর ভেঙ্গে

দু'খানা হয়ে গেল। চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল ঘোষের। কয়েক মিনিট স্তম্ভিতের মত বসে রইল সে।

হীরে। আলোয় ঝকমক করছে। আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ছে। করকর শব্দ করে কাচে দাগ ফেলছে। মট করে দাগে ভেঙ্গে যাচ্ছে কাচ।

হীরে! এ হীরে!

এর পর ছেলেমানুষ যেমন সাদা কাগজে কালির দাগ টানে, তেমনি করে পাথরটা দিয়ে কাচখানার টুকরো দুটোকে নিয়ে দাগ টানতে লাগল।

কর-র! কর-র! কর-র! কর-র!

মট্! মট্! মট্! মট্!

চাপ দিয়ে ভাঙ্গতে লাগল। পাটালির মত! বরফির মত!

হীরে! হীরে! হীরে!

কত দাম হবে? ওজনে পোয়াখানেক! ওঃ—। মনে মনে হিসেব কষতে লাগল এক রতি হীরার দাম যদি দশ টাকা হয়—

উঁহু—দশ টাকায় হীরে পাওয়া যায় না। গোমেদের দামই কত? কুড়ি টাকা! না—চল্লিশ টাকা! উঁহু আশী একশো টাকা। একশো টাকা! আলবাৎ একশো টাকা।

'এক রতি হীরার দাম একশো টাকা হইলে—এক পোয়া হীরার দাম কত হইবে?' ছিয়ানব্বুই রতিতে এক তোলা। আশী তোলায় সের। এক পোয়া সমান কুড়ি তোলা। তা হলে কুড়ি গণিত ছিয়ানব্বুই, উনিশশো কুড়ি—দু'হাজার—দু'হাজার। দু' হাজার গণিত একশো। একশো হাজারে এক লাখ—দু'লাখ দু'লাখ দু'লাখ।

সঙ্গে সঙ্গে সে কর-র শব্দে ছোট ছোট টুকরোগুলোর উপরও দাগ টানছিল এবং মট মট করে ভাঙ্গছিল। এর মধ্যে ভাঙ্গা কাচে দু'খান হাত কেটে তার রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। হীরে।

দু'লাখ। দু'লাখ তার দাম। বেশীও হতে পারে। বিশ লাখও হতে পারে।

মাথা ঘুরছে ঘোষের। সে শুয়ে পড়ল।

হীরে। দু'লাখ। দশ লাখ। বিশ লাখ।

—হীরে। হীরে বলেই মনে হচ্ছে।

বললেন পুরনো জমিদার বংশের বৃদ্ধ হেমন্তবাবু। রমন ঘোষদের গ্রামেরই জমিদার ছিলেন একদিন। এখন অবশ্য জমিদারীই উঠে গেছে। জমিদার নন। তবে গায়ের গন্ধ, মেজাজ এবং জমিদার বাচ্চার চোখ কোথায় যাবে? কুকুরে অন্ধকারেও চোর ঠাওর করতে পারে, বেড়ালে অন্ধকার ঘরে কোন্ কোণে ইঁদুর আছে জ্বল জ্বলে চোখে ঠিক দেখতে পায়, জমিদার-বাচ্চা একদিনের জমিদার—হেমন্তবাবু পাথরটা দেখে ঠিক বলে দিলেন। হীরে! হীরে বলেই মনে হচ্ছে।

খবরটা চারিদিকে রটে গেছে। ঘোষ পরের দিনই হেমন্তবাবুদের বাড়ির সেঁকরা বাগালকে ডেকে পাথরটা দেখিয়েছিল।—দেখতো বাবা বাগাল!

বাগাল দেখে-শুনে পাথরটার মধ্যে আলোর ছটার ফলন দেখে, কাচ কাটা দেখে বেশ একটু বিস্মিত হয়েছিল—তাই তো ঘোষ। তাজ্জব লাগছে। এ তো—

—কি এ তো?

—দামী পাথর বলেই তো লাগছে।

—দামী পাথর? হীরে! হীরে! হীরে!

বাগালের কাছ থেকেই কথাটা বোধ হয় ছড়িয়েছে। এ আসছে পাথরখানা দেখি? ও আসছে—দেখান একবার ঘোষ মশায়!

হেমন্তবাবু ডেকে পাঠালেন—পাথরটা নিয়ে একবার আসবে।

কথাটা অমান্য করলে না ঘোষ। হেমন্তবাবু ঠিক বলে দেবে।

ওদের আঙটিতে হীরের চলন অনেক দিন থেকে। বউদের নাকছাবিতে হীরে ভিন্ন অন্য পাথর ওদের বসাতে মানা। ওদের চোখে নাকছাবির পাথর হীরে, পাইকারের চোখে গরুর মত চেনা। দেখলেই ঠিক যেন বলে দেবে ঝুটো কি আসল।

হেমন্তবাবু ঠিক ধরলেন। হেসে বললেন—তোমার কপাল ঘোষ। ভাগ্যবান হে তুমি। জান এই তিন পাহাড়ী স্টেশন—জানতো? রাজমহল যেতে তিন পাহাড়ীতে নামতে হয়। সেখানকার এক স্টেশন মাস্টার কত আর মাইনে ওদের হে? অ্যাঁ। কোন রকমে চলে আর কি। ফাঁকা জায়গায় স্টেশন চারিদিকে পাহাড় তো, তা বাতাস খুব। আর সেই বাতাসে টেবিলের উপর থেকে কাগজপত্র ফরফর করে উড়ে যায়। উঠে গিয়ে ধরতে হয়। একদিন বিরক্ত হয়ে কতকগুলো পাথর কুড়িয়ে আনে। বুঝেছ। টেবিলের উপর কাগজ চাপা দেয়—ওড়ে না। এখন একদিন রাত্রে বুঝেছ না, এক মাড়োয়ারী সে গেছে তিন পাহাড়ীতে পাথরের কোয়েরী করবে—তারই জায়গা দেখতে। জায়গা দেখে ফিরবে। স্টেশনে এসেছে। রাত্রিকাল ট্রেনের খানিকটা দেরি আছে, কাজেই এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে স্টেশনে এসে ঢুকে জিজ্ঞেস করলে, বাবুজী টেরেনকে কেতনা দেরি হ্যায়? রাত্রে স্টেশন মাস্টার একা বসে কাজ করছে।

মাস্টার কাজ করতে করতেই বললে, দো ঘণ্টা।

—দো ঘণ্টা? তব তো হিঁয়া থোড়া বৈঠে হম। বলে বসল। বসে এটা ওটা দেখছে—কখনও গুনগুনিয়ে 'ঠমকি চলত রামচন্দ্র' গাইছে, এমন সময় চোখ পড়ল পাথরটার উপর। হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললে, বাবুজী এ পাথল তুমি কোথায় পেলে?

—কেন?

—পাথরটা আমাকে দেবে?

—তুমি কি করবে?

—কাম কুছু হোবে। লেকিন হম অপকো দাম থোড়া দেগা।

মাস্টার বাঙালীর ছেলে—চালাক ছেলে, বললে—দাম আমাকে আরও দু'জনে বলে গেছে আমি দিই নি। তোমার দাম তুমি বল।

—পান শো।

হা-হা করে হেসে মাস্টার বললে—পাঁচ হাজারে দিই নি, তুমি বল পান শো। রাখ, ওটা দাও। বলে হাত থেকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্টেশনের সিন্দুকে বন্ধ করলে। তারপর দিনই একেবারে কলকাতা। সেখানে জহরতওয়ালাদের দোকানে গিয়ে হাজির। তারা দেখেই তো লাফিয়ে উঠল। পাঁচটা দোকান ঘুরতেই দর উঠতে লাগল। শেষ পঞ্চাশ হাজারে বেচে দিয়ে মাস্টার চাকুরি ছেড়ে দিয়ে জমি-জেরাত কিনে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস—বুঝলে না।

তবে তোমার আবার সুখে-স্বচ্ছন্দে! টাকার কাঁড়ির উপরেই তো রয়েছ। সেই খাটো কাপড় আর মাথায় তালপাতার ছাতা। সেই কড়াই বাটা আর ভাত। বউ মরে গেল, একটা বিয়েই করলে না হে! দিয়ে দাও পাথরটাকে আমাকে, কিছু টাকা নিয়ে দিয়ে দাও। আমি শেষ বয়সে একটু আরাম করে নি। খেল খেলে যাই। কলকাতায় বাড়ি কিনে গাড়ি করে নতুন বিয়ে না-করি একটা বাউজী রেখে হোলি খেলে নিই। দেবে?

হাসতে লাগলেন হেমন্তবাবু।

লজ্জিত হয়ে ফিরে এল রমন ঘোষ। আসবার পথে খুক-খুক করে হাসছিল ঘোষ। বাবু এই বয়সে বললে, মুখ ফুটে বললে ওই কথাগুলো! কিন্তু বলেছে বেশ। খাসা!

বাড়ি করে, গাড়ি কিনে নতুন বিয়ে—

খি-খি-খি করে হেসে সারা হয়ে গেল ঘোষ।

বাড়ি ফিরতেই কড়ি জিজ্ঞাসা করলে, বাবু নাকি পাথরটার দাম বলেছে লাখ টাকা?

ঘোষ চমকে উঠল। কটমট করে কড়ির দিকে চেয়ে রইল

খানিকক্ষণ। তারপর বললে, তাতে তোর কি? বল্‌ তোর কিরে হারামজাদ?

কড়ি ভুরু কুঁচকে বললে, খবরদার বলছি। হারামজাদ হারামজাদ করো না বলছি।

—মারবি নাকি রে হারামজাদ?

—খুন করব। চীৎকার করে উঠল কড়ি! এবং গটগট করে উঠে গেল।

কড়ির এ-ধরনের শাসানী নতুন নয়, ঘোষ এর জবাবও দেয়—কুত্তার বাচ্চা দূর করে দোব। পথে বের করে দোব। কিন্তু আজ আর সে জবাব দিলে না। শুধু বললে, বটে! এবং ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে পাথরটি হাতে করে চুপ করে বসে রইল।

সন্ধ্যাবেলা মানদা ডাকলে, দাদা শুনছ?

উত্তর দিলে ঘোষ—কালা তো হইনি, কি বলছিস বল না কেন?

—ঘরে বসে আছ সেই তখন থেকে—

—বেশ করছি। আমার খুশী আর বেরুব না। মরব। সবচেয়ে জোর আলোটা জ্বেলে দিয়ে যা দেখি! কাচটা খুব ভাল করে ছাই দিয়ে মেজে দিবি।

আলোটা দিয়ে যেতেই, জোরালো করে জ্বেলে দিয়ে, পাথরটা সামনে রেখে আবার চুপ করে বসে রইল ঘোষ। জ্বলজ্বলে ছটা যত রাত্রি হচ্ছে তত যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। ওঃ, আগুন বের হচ্ছে যেন! মনে হচ্ছে, আগুন ধরে যাবে!

হীরে! হীরে! ঝলমল করে ছটা বের হচ্ছে।

ঘোষ নিজের বুকের উপর ধরলে পাথরটা। ওঃ, ঠিক কৌস্তুভ মণি! বলিহারি—বলিহারি! বলে লাখ টাকা দাম! দশ লাখ টাকা দাম! বিশ লাখ টাকা! ওই বাবুর হাতে হীরে তো সে দেখেছে, তাতে কোথায়—এমন আলো কোথায় বের হয়? আর এতটুকু টুকরো। তারই দাম বলে, আড়াই শো টাকা! আর এমন

হীরে—! এমন ঝলমলে ছটা—আর এত বড় পাথর, এ থেকে এমন কত টুকরো বের হবে। একরাশি।

লাখ টাকা? দশ লাখ, বিশ লাখ! শা—!

যাঃ, বেটা হারামজাদ ভাগ জোতদারেরা, যাঃ, নেহি মাংতা হ্যায়। যাঃ, ও জমি তোরা নিয়ে নে। ঘোষের টাকা—সুদ অনেক দিন উঠে গিয়েছে। এবার তোরা খেগে যা। নেহি মাংতা হ্যায়! সব জোতদার, যেখানে যে আছে, দেবে তাদের ছেড়ে জমি। জয় জয়কার। জয় জয়কার পড়ে যাবে ঘোষের। বদান্য—মহানুভব—মহাত্মা-টহাত্মা—বলে হৈচৈ করবে সব।

দশ লাখ না বিশ লাখ! না—দুয়ের মাঝামাঝি পনের লাখ। এই ঠিক পনের লাখ। পঞ্চদশ লক্ষ! ঠিক হ্যায়।

আচ্ছা আচ্ছা। এই তো আধুলিটা—এই আধুলির এই দিকটা দশ এই দিকটা বিশ; দাও ছুড়ে আধুলিটাকে দেখি কোন দিক ওঠে।

ঠং করে পড়লো আধুলিটা।—এঃ দশ লাখ!

এ ছোড়াটা কিন্তু ঠিক হয় নি।—না হয় নি। উপরে উঠে ঘোরে নি। ফের আর একবার। আবার আধুলিটা বুড়ো আঙুলের টোকা দিয়ে ছুড়ে দিলে। ইয়া। এবার বিশ লাখ।

আচ্ছা—আবার। ইয়া আবার বিশ লাখ।

বিশ লাখ টাকা। যার বিশ লাখ টাকা সে ওই চাষের জমি নিয়ে করবে কী? নেহি মাংতা হ্যায়। বিশ লাখ। বিশ লক্ষ। বিংশতি লক্ষ। এক জায়গায় ঢাললে কত হয়?

আত্মা! এত টাকা নিয়ে সে করবে কী? কী করবে? কী করবে? ওই কড়ি আর ঝড়ি—দুটো হারামজাদের জন্যে—?

উঁহু! উঁহু! উঁহু!—ওদের জন্যে যা আছে তাই অনেক! ভাগ জোতদারের জমি ছেড়ে দিয়েও—বাড়িতে খাসে তার চারখানা

হালে আবাদী উৎকৃষ্ট জমি একশো-কুড়ি বিঘে। একশো কুড়ি বিঘেতে বছরে বিঘে পিছু আট মন ধান হলে, নশো ষাট মন ধান। দশ টাকা মন হিসেবে ন হাজার ছশো টাকা। এ ছাড়া আখ, গম, আলু, কলাই, তিল হবে। সেও অনেক। বারো মাসে বারো হাজার টাকা, তার হাজা-শুকো নাই। তা ছাড়া বন্ধকী কারবারে বিশ হাজার টাকা খাটছে। ওই হেমন্তবাবুর গহনা তার সিন্দুকে বন্ধক থাকে। এ ছাড়া পুকুর আছে, বাগান আছে।

তিরিশ বিঘের বেশী আবাদী জমি রাখতে দেবে না? শা—। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। মন্ত্রী মশায়ের বুদ্ধির ফাঁক দিয়ে সুড়ুৎ করে টিকটিকির মত পার হয়ে গেলেই হবে। কাটাই যদি পড়ে তো পড়বে লেজটা, পড়ে নড়বে। কো-অপারেটিভ সোসাইটি ফেঁদে বসবি। ব্যাস। ডাঙাগুলোয় লাগিয়ে দে তালের আঁটি; ছাড়িয়ে দে কাঁটাল-বিচি, আমের আঁটি। ব্যাস ফলকর বসে যাবে! শা—!

চালিয়ে যেতে পারলে ওতেই রাজার হাল। না পারলে কিছুই থাকবে না বাবা! ব্যাস্ ব্যাস্, ওতেই হারামজাদার বেটা হারামজাদদের ঢের দেওয়া হবে। এতেও যদি কেউ কিছু বলে, বলুক। গ্রাহ্য করে না রমন ঘোষ। কোন কালেই করেনি গ্রাহ্য কারুর কথা, আজও করবে না।

চলে যাবে সে। কোথায় যাবে? কোথায়? দিল্লী? বোম্বাই? কলকাতা? বিলাত? কোথায়?

বাড়ি করবে। সুন্দর বাড়ি। সামনে বাগান, বাড়িটি ছবির মত। দেখে এসেছে সে, কলকাতা গিয়েছিল গত বছর, তখন দেখে এসেছে। শ—। সুন্দর ঘর, সুন্দর দোর, সুন্দর মেঝে—সে আবার বাহার কত মেঝের, ফুটকি ফুটকি কালো সাদা দাগ-ওয়ালা লাল-সবুজ-হলদে রঙের কাচের মত পালিশ করা মেঝে। ইলেকট্রিক লাইট, ফ্যান। গদি-আঁটা চেয়ার। বসলে বোঁক্ করে বসে যায়। আবার

দোলে! বাড়ির সামনে সবুজ ঘাস-ওয়ালা খানিকটা বাগান। হরেক রঙের ফুল। দেবে সরষে বুনে—ফুল কে ফুল, ফসল কে ফসল। সরষে বাটা দিয়ে ইল্‌শের ঝাল! আর আর—। শা—, মুরগী। মুরগীর সুরুয়া। খাবে মুরগী। খাবে। কখনও খায়নি—কিন্তু এমন উৎকৃষ্ট মাংস আর নাকি হয় না; এবার খাবে। এই যে টাকা, এ বয়সে এমন করে সে পেলে কেন? সাধ মেটাবার জন্য। খাবে মুরগী সাধ মিটিয়ে। হাঁ! নিশ্চয়! বিধাতাপুরুষ ফিসফিস করে তার কানে কানে বলছেন, সে শুনতে পাচ্ছে যে! বলছেন, 'ওরে কষ্ট করে টাকা জমিয়ে তো খেতে পারলিনে, ভোগ করলিনে. আচ্ছা এবার আমি ছপ্পর ফেড়ে দিলাম; এবার ভোগ কর!' স্পষ্ট শুনছে সে। হেমন্তবাবুর মুখ দিয়ে ও কথাগুলো বিধাতাপুরুষের। কানের কাছে অহরহ শুনছে। আর সে অমান্য করবে না। ওঃ বুকের ভিতরে চাপা-পড়া সাধগুলো কিল্‌বিল্‌ করে বেরিয়ে পড়েছে। সারা শরীরটা যেন শিউরে শিউরে উঠছে।

খাবে মুরগীর মাংস, শুধু মুরগীর মাংস? আরও খাবে।

হুঁ! হুঁ! লাল পানি। বিলাতী মদ! রোজ মুরগীর মাংস আর বিলাতী মদ মাপ করে খেলে নাকি পরমায়ু বাড়ে। গাল-গুলোয় রাঙা ছাপ ধরে। শা—, নাকি নবযৌবন হয়। আর চোখের সামনে নাকি ফুল ফোটে। তারপর?

হুঁ! হুঁ! তারপর নবযৌবন যখন হবে, তখন—।

না—না। ওই হেমন্তবাবুর মত বাঈজী রাখতে পারবে না। একটি বেশ বয়স্থা মেয়ে দেখে —। মাথায় কলপ মাখলেই চুল কালো। বিলাতী মদে আর মুরগীতে নবযৌবন, গাল লাল। ব্যাস। বয়স্থা একটি মেয়ে, গরীবের মেয়ে, বেশ ভাল রাঁধতে পারে, বেশ মিষ্টি কথা, উল বুনতে পারে, বেশ একটু লেখাপড়া জানে এমন মেয়ে। রোজ সন্ধ্যেবেলা বায়স্কোপ দেখতে যাবে। রোজ!

হ্যাঁ—হ্যাঁ। একখানা মোটর গাড়ি কিনতে হবে। বেশ

ছোটখাটো। দু'জনে বসলে যেন গায়েগায়ে বেশ ঘেঁষাঘেঁষি হয়। মোটর গাড়িতে চ'ড়ে যাবে সিনেমা দেখতে।

আচ্ছা একটি ওই সব সিনেমার মেয়েকে বিয়ে করলে কী হয়? এখন তো সব এমন কত বিয়ে হচ্ছে! উঁ-হু। না না। ওদের ঠিক সামলাতে পারবে না। না না। তার চেয়ে এমনি মেয়ে, গরীবের মেয়ে ভাল; গান নাচ জানা মেয়ে বিয়ে করলেই হবে। ব্যাস, ব্যাস! ওই ঠিক।

—দাদা! অ দাদা শুনছ?

চমকে উঠল ঘোষ। তারপর চীৎকার করে উঠল দুরন্ত ক্রোধে, 'কী, কী, কী? কা চাই তোমার রাক্ষুসী ডাইনী?'

—বলি রাত্রি যে অনেক হল।

—তা হোক।

—ইষ্ট স্মরণ কর!

—করব না। ইষ্ট স্মরণ! ইষ্ট স্মরণ! চুলোয় যাক ইষ্ট স্মরণ। বিরক্ত করিস নে আমাকে।

—ওমা সে কী কথা গো! ক্ষেপে গেলে নাকি?

—গিয়েছি, বেশ করেছি।

—বেশ করেছ, করেছ। বেশ হয়েছে ক্ষেপেছ। ইষ্ট স্মরণ না হয় নাই করলে—খাবে না? খাবার তৈরি করে বসে আছি, ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।

—আগুনে গুজে দে। গরমও হবে। ছাইও হবে। বিরক্ত করিস নে—আমি খাব না।

—সে কি—

—খাব না—খাব না—খাব না! খাব না—খাব না।

চীৎকার করতে লাগল রমন ঘোষ; সে প্রায় উন্মাদের মত। ওঃ রেহাই তাকে পেতেই হবে—এই মানদার কবল থেকে—ওই

কড়ি ঋড়ি দুই হারামজাদের হাত থেকে, এই হতভাগা সমাজ—এই ছোটলোকের গ্রাম থেকে উদ্ধার তাকে পেতেই হবে।

কলকাতার সুন্দর বাড়িতে—সুন্দর আসবাবের মধ্যে পরমানন্দে বাকী দিন ক'টা কাটিয়ে দেবে। ভোগ করবে। শা—, চীৎকার ক'রে হাঁপানি ধরে গেল। ঘেমে উঠেছে রমন ঘোষ! আঃ—সর্বনাশী মানদা, এমন আচমকা ডাকে। চমকে উঠতে হয়, বুকের ভিতর খচ করে উঠল। রমন ঘোষ এসে বসল তক্তাপোশটার উপর।

এরকম শরীর যেদিন খারাপ করবে, সেদিন সিনেমায় যাবে না। সেদিন বাড়িতে বসে এক ডোজ বিলাতী মদ বেশী করে খাবে। বলবে, দাও তো—

কি নাম হবে বউয়ের? লতিকা! হ্যাঁ লতিকা।—দাও তো লতিকা এক ডোজ।

লতিকা বলবে, সে কী? এই তো খেলে।

—শরীরটা খারাপ করছে। এই বুকের এইখানটা—। হাঁ—দাও। আর একখানা গান কর। আর একটু নাচ। আজ আর সিনেমা থাক।

লতিকা গাইবে, 'চোখে চোখে রাখি হায়রে, তবু তারে ধরা যায় না!'

রমন ঘোষ এ গানটা শুনেছে। মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। রমন ঘোষ বোধ করি আত্মবিস্মৃত হয়েই দু'হাত বাড়িয়ে সুরে ডেকে উঠল—আয় না?

—এস এস লতিকা এস! একটু বুকে হাত বুলিয়ে দাও। এইখানটা। এইখানটা। আঃ—আঃ—।

রমন ঘোষ সশব্দে তক্তাপোশ থেকে পড়ে গেল মেঝের উপর।

## ॥ তিন ॥

পরের দিন সকালেও রমন ঘোষ উঠল না দেখে মানদা ডাকলে কড়িকে। কড়ি ডেকে সাড়া না পেয়ে পাড়া গোল করে তুললে। দরজা জানালা সব বন্ধ। নিঃশব্দ নিঝুম ঘরের ভিতরটা। শুধু কেরোসিনের আলোর গ্যাসের গন্ধ বেরিয়ে আসছে কপাটের জোড়ের ফাঁক দিয়ে। কড়ি লাথি মেরে ভেঙে ফেললে দরজার খিলটা। সশব্দে দু'পাশের দেওয়ালে আছাড় খেয়ে খুলে গেল দরজা। ভক্ করে কেরোসিনের আলোর গ্যাস বেরিয়ে এল। ঘরের ভিতরের জ্বলন্ত আলোটাও মুহূর্তে দপ ক'রে নিভে গেল।

ঘরটার আবছা অন্ধকারের মধ্যে রমন ঘোষ মেঝের উপর পড়ে আছে। নিথর। দেহটা হিমশীতল। কঠিন হয়ে গেছে। হাতে তার পাথরটা।

মরে গেছে রমন ঘোষ।

* * * *

পাথরটা কড়ি রমনের শ্রাদ্ধের পর কলকাতায় নিয়ে গেল। ঐ টাকায় রমনের নামে হাসপাতাল কি কিছু একটা হবে।

পাথরটা হীরে মণি মানিক নয়। পেবেল। কাটলে পেবেল বের হবে। তার দাম আর কত? কাটাইয়ের জন্য তার চেয়ে বেশী টাকা লাগবে।

মানদা পাথরটা গঙ্গার জলে ফেলে দিলে, গঙ্গাস্নানে গিয়ে।

—যা জলে।

# রবিবারের আসর

মজলিসে সে প্রায় হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। শান্তিপুরে অশান্তি হ'তেই পারে—কারণ শান্তিপুরে রক্তমাংসের মানুষেরা বাস করেন এবং তাঁদের শান্তিপুরেও—অন্নাভাব বস্ত্রাভাব অর্থাভাব প্রভৃতি যাবতীয় অভাব দেশের অন্যত্র যেমন আছে—তেমনই আছে। শান্তিপুরে অশান্তি নয়—শান্তির নামে অশান্তি। মানুষের স্বভাবের মধ্যে চিরকালের একটি নৈয়ায়িক আছেন। কোন সমস্যা উপস্থিত হলেই আপন-আপন ন্যায়বোধ অনুযায়ী সমস্যার আলোচনায় দুই বা ততোধিক পক্ষে ভাগ হয়ে গিয়ে বিনা ফিয়েই প্রথমে ওকলাতি, পরে ক্ষেত্রবিশেষে দাঙ্গা পর্যন্ত অগ্রসর হন। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, বিশ্বের শান্তির কথা উঠেছিল একান্ত নিরীহভাবে—তা থেকে প্রচণ্ড তর্কে সে প্রায় যুদ্ধ উপস্থিত হল।

কথাটা তুলে ফেলেছিল—ডাক নাম বেজো—ভাল নাম অশোক; ছোকরার মেজাজটা মিষ্টি এবং প্রকৃতিতে বেশ রসিক। কিন্তু বদমেজাজ যেমন সবারই থাকে, ওরও আছে। গেল মাসের আন্তর্জাতিক কাগজ পড়ছিল, পড়তে পড়তে বন্ধ করে বললে—সাধু! সাধু! আচ্ছা লিখেছেন। একেবারে যাকে বলে—ঝেড়ে কাপড় পরিয়ে দেওয়া।

পানু—ওর ছোট ভাই—সে বেশ পাণ্ডা লোক—কলেজ ইউনিয়নের খুঁটি—শরীরটা অসুস্থ, তা না হলে স্তম্ভ হয়ে দাঁড়াতো, সে বললে—কে? কাকে?

—শচীন সেনগুপ্ত! অ্যামেরিকার পর্দা ফাঁক ক'রে দিয়েছেন। অ্যামেরিকাই যে যুদ্ধবাজ প্রমাণ করে দিয়েছেন। একেবারে সব ফ্যাকচুয়াল ডাটা দিয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রাশিয়া অ্যাটম বোমা থাকতেও যুদ্ধ চায় না। তার শান্তি-কামনা জেনুইন। এমন কি হাঙ্গেরীর দাঙ্গা সম্বন্ধেও প্রমাণ করেছেন যে, ওটা নিতান্তই কৃত্রিম—একদল লোককে ঘুষ দিয়ে তৈরী করা। রাশিয়া ত্বরিতগতিতে অল্প রক্তপাত ক'রে দমন না করলে বিশ্বযুদ্ধ হতে পারত। পড় না কলম্বো সম্মেলন প্রবন্ধটা; প্রায় তিরিশ পাতা।

সিধু—অর্থাৎ সিদ্ধার্থ তৃতীয় ভাই বললে—থাম থাম। আসল কথা বললে চটে যাবে তুমি।

—চটবই তো, নিরপেক্ষ লোক সম্পর্কে যা তা বললে নিশ্চয় চটব।

—বেশ। যুগান্তরের বিবেকানন্দবাবুর অ্যামেরিকা সম্বন্ধে বক্তৃতা পড়েছ? প্রেসিডেণ্ট সম্পর্কে বলেন নি—তিনি প্রকৃতিই শান্তিকামী?

সন্তু সব থেকে বড় জাঠতুতো ভাই—গভর্ণমেণ্টের গেজেটেড অফিসার এবং বয়স যা তা থেকে অনেক বিজ্ঞ কথা কয়—সে খবরের কাগজ পড়ছিল—এবার মুখ তুলে বললে—ওরে বাপু যত মুনি তত মত। ও হল অন্ধের হস্তী দর্শনের মত। এক অন্ধ হাতীর পায়ে হাত বুলিয়ে বললে—হাতী থামের মত গোল। একজন লেজ নেড়ে দেখে বললে—দূর্, দড়ির মত।

সন্তুর ছোট ভাই কটু—ইঞ্জিনীয়ার কিন্তু বড় বদমেজাজী। তার দাড়ি বড় শক্ত—কামাতে বড় কষ্ট হয়। সে কামাচ্ছিল—এবার ক্ষুরটা বাঁ হাতে ধরেই দু' হাত নেড়ে প্রায় দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠল—তবে আর কি সন্তুবাবুর লজিক অনুসারে শান্তি হল হাতী। পৃথিবীতে রাজ্যে রাজ্যে হাতী পুষলেই শান্তি এসে যাবে।

এবং বোধ করি সন্তুবাবুর হিরো জহরলাল দেশে দেশে সেই কারণেই হাতী উপহার পাঠাচ্ছেন।

তারপর বললে—ভারী দোষ তোমার। এমন করে বিজ্ঞ কথা বলে কথা চাপা দাও! অথচ শান্তির দরকার বোধ হয় আদিযুগ থেকে একাল পর্যন্ত আজই সবচেয়ে বেশী। জীবন একেবারে খাক্ হয়ে গেল! আর ওই শান্তি শান্তি করে যে আন্দোলন তার সম্পর্কেও আলোচনা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। আই কল ইট এ ধাপ্পাবাজী—

বেজো ফোঁস করে উঠল—হোয়াই?

দাঁতে দাঁত টিপে কটু একেবারে বিস্ফোরিত হয়ে গেল—হো-য়া-ই?

—ইয়েস; হোয়াই?

—স্যার—দেন—মানে তা হলে যারা দেশে রক্তাক্ত বিপ্লবের নামে ধেই ধেই করে নৃত্য করে—হাতের মুঠি বন্ধ করে বাতাসে ঘুষি মেরে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে চেঁচিয়ে এক গা ঘেমে—দু গেলাস জল খেয়ে জলের বাজারে দুর্ভিক্ষ লাগায়—তারা কেন সেখানে দলে দলে? হোয়াই? টেল মি।

—টেল মি?

—ই—য়ে—স্। টেল মি।

—গণ-অভ্যুদয় আর সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ এক হল?

—হ্যাঁ হে—রক্তপাত যে দুইয়েই। রক্তপাত মানেই অশান্তি! ও তো গরু কাটা আর পাঁঠা কাটা। বড় আর ছোট। এবং এ বলে ওটা অন্যায়, ও বলে এটা অন্যায়। অ্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত লাগাও দাঙ্গা। বন্ধ করবে তো দুই-ই কর, তবে বুঝি। যে পাঁঠা, গরু, মাছ কিছু খায় না—কিছু হত্যার পক্ষপাতী নয়—তার কথা শুনতে পারি। অন্যের নয়, টিকি থাকলেও নয়, ক্ষুর থাকলেও নয়।

বেজো এবার বলে—আপনাদের কাকা কালেলকর তো একেবারে

নিরামিষ, গান্ধী-পন্থী—তিনি এবার কলম্বো সম্মেলনে গিয়ে কি বলেছেন পড়ুন!

—কি বলেছেন?

—বলেছেন, শান্তি আন্দোলন সম্পর্কে আমার এতদিন ভ্রান্ত ধারণা ছিল—

বাধা দিয়ে ইঞ্জিনীয়ার বললে—কাকা কালেলকরকে নমস্কার। কিন্তু তিনি একথা যদি বলে থাকেন—তবে তাঁর কথা আমি মানি না। নো—নেভার। ইউ সি—কারুর দোহাই আমার কাছে চলবে না। নো।

—আপনার চারটে হাত গজিয়েছে।

—তোমার শিঙ গজিয়েছে বুঝতে পারছি—এবার গুঁতিয়ে পেট ফাটিয়ে রক্তপাত করে তুমি শান্তি শান্তি করে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে বেড়াবে।

—এই এই। কি হচ্ছে তোমাদের? ঘরে ছুটে এসে ঢুকল ভেটকী—মানে সন্তু কটুর কনিষ্ঠা সহোদরা; বাপের আদরের দুলালী এবং ইঞ্জিনের সিগন্যালের মত বাবার সিগন্যাল। ভেটকী আসা মানেই বাবা আসছেন।

—মাই গড! চুপ করহে সব। দ্যাট ক্যান্টাঙ্কারাস অটোক্র্যাট ইজ কামিং। স্টপ!

—উঁহু! ভেটকী বললে—অটোক্র্যাট নয়। দি গ্রেটেস্ট ডেমোক্র্যাট; সুইট ওল্ডম্যান দাদু!

—দাদু?

—হ্যাঁগো ত্রিকাল দাদু। দি ভেটার্ণ স্টোরী টেলার!

সব অশান্তি মুহূর্তে মিটে গেল। আনন্দ রোল উঠল—দাদু দাদু! গল্প গল্প!

স্থূলকায়, নধর-ভুঁড়ি, প্রসন্ন-কান্তি, ত্রিকাল দাদু এসে ঘরে ঢুকলেন। কি গো! শান্তি শান্তি করে অশান্তি কেন এত?

—ছেড়ে দিন ওকথা। ওসব আপনি বুঝবেন না। শান্তির নামে ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স! আন্তর্জাতিক রাজনীতি। ওসব যাক, আপনি গল্প বলুন।

ত্রিকালদাদু গল্প বলেন। ওই তাঁর পেশা। বাংলা দেশের অতীতকালের একখানি মূল্যবান কাঁথাশিল্পের শেষ নমুনার মত সেকালের গল্পবলিয়েদের বোধ করি শেষ জন। ভাগবত কথকদের মত, আসর করে গল্প কথকতা করতেন, গল্পটি বলতে শুরু করলে বেতালপঞ্চবিংশতির মূল গল্পের সঙ্গে দশ বিশ পঁচিশটি অন্য গল্প বলে তারপর মূল গল্পটি শেষ হত। মূল গল্পটি সূতো, বাকীগুলি ফুলই বল মণিমুক্তাই বল—তাই। কিন্তু সে আর শোনে কে? সে দেশ কাল অতীত হয়েছে। তবুও এ বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তাঁর অনেক দিনের। এইসব ছেলেদের সূতিকাগারের সামনে গোটা পরিবারের আসর পেতে গল্প বলেছেন। গল্প সবই প্রায় জানা; কিন্তু জানা গল্পও ত্রিকালদাদুর মুখে পুরনো হয় না, সুগায়কের কণ্ঠের গানের মত। প্রতিবারই নতুন। আরও গুণ আছে ত্রিকালদাদুর, তিনি গল্প বানাতেও পারেন। তবে একালের তরুণ তরুণী বা এ কালের সমস্যা নিয়ে নয় এবং টেকনিকও তাঁর একালের লেখকদের মত নয়; ও তাঁর নিজস্ব। সে টেকনিকে গল্পগুলো কোকটেলস না টেল না অ্যানেকডোট না সর্ট স্টোরী না উপন্যাসধর্মী সে বলতে পারেন সমালোচকেরা—এ বাড়িতে শ্রোতারা তার বিচার করতে চায় না, ওরা খাঁটি ভোজনরসিক খাইয়ের মত খাঁটি গল্পশুনিয়ে লোক—ওরা জিভে টোকার মেরে হাত চেটে পাত চেটে পেটভর্তি করে খাওয়ার মত গল্প শোনে। ত্রিকালদাদু মধ্যে মধ্যে হঠাৎ এসে প্রায় উদয় হন—অনির্দিষ্ট তিথিতে আগন্তুক অতিথির মত। শুধু একটি ঠিক থাকেন—সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত যে বারেই আসুন, রাত্রিটা থেকে যান। আর রবিবার এলে রাত্রে থাকেন না

এমন নয়, তবে কখনও কখনও সন্ধ্যের আগেই চলে যান। অর্থাৎ গল্প একটা না শুনিয়ে যান না। প্রয়োজন মত মণিমালার কারবার করেন—আবার একটি মণি বা মুক্তো কি পান্না এও তাঁর আছে—সেটিকে সকলের মাঝখানে নামিয়ে দেন। একটি গল্পেই একদিনের পালা শেষ করে বলেন—গল্প হল সত্যি, যে বলে সে মিথ্যেবাদী, যে শোনে সে হল ভাবগ্রাহী জনার্দন। জয় জনার্দন!

একটি টিপ নস্য নিয়ে ত্রিকালদাদু বললেন—তোদের তো বেশ জমে উঠেছিল রে। বড় বড় কথা। তার মধ্যে গল্প কেন? শান্তি অশান্তি নিয়ে গভীর তত্ত্ব ভাই; বেজো ভাই মধ্যে মধ্যে বলে—কল্যাণ কল্যাণ। আবার বলে মূল্য মূল্য মানে মূল্য কি? তা—

বাধা দিয়ে বোন ভেটকী বললে—ও নিয়ে মীমাংসা রাশিয়া করুক, আমেরিকা করুক, নেহরু পঞ্চশীল নিয়ে ছুটে বেড়াক; তা নিয়ে সম্মেলন হোক—যারা বক্তৃতা করেন করুন। বেজো চেঁচাক—শান্তি চাই, শান্তি দীর্ঘজীবী হোক বলে, পৃথিবীতে শান্তি আসুক; কিন্তু আমাদের এই রবিবারের সকালের মেজদা আর বেজোর তকরারের অশান্তির একমাত্র উপায় তোমার গল্প। গল্প বল। আমি শুরু করে দিই—কি বল?

—বহুত আচ্ছা। তাই দে শুরু করে।

ভেটকী শুরু করলে মিহিগলায়—সে এক মস্ত বড় বন। ডাল পড়লে ঢেঁকি হয়—পাতা পড়লে কুলো হয়। কিন্তু তাই বা করে কে? জনমানব নাই। থমথম করছে অন্ধকার; সনসন করছে বাতাস, ঝরঝর করে ঝরছে পাতা, আর কলকল করছে পাখী, সুরে বেসুরে—মানে কেউ গাইছে গান—কেউ করছে মারামারি, আর উঠছে জন্তুর কোলাহল, হরিণ ছুটছে দড়বড় করে, বাইসন্—

বাধা দিয়ে ত্রিকালদাদু বললে—কি—কি?

—বাইসন! বাইসন! মানে ভয়ঙ্কর বুনো মোষ।

—আচ্ছা।

—নেকড়েরা চেঁচাচ্ছে—গণ্ডার জলা ঘাসের মধ্যে ঘুরছে, দুটোতে হয়তো লড়াই লাগিয়েছে। হাতীর দল মড়মড় করে ডাল ভাঙছে। মধ্যে দল বেঁধে কুক দিচ্ছে; দুটো চারটে দাঁতাল ক্ষেপেছে; চীৎকার করে ছুটছে, লড়াই করছে, বনের ওই হরিণটরিনগুলো পায়ের তলায় পিষে যাচ্ছে।

ত্রিকালদাদু বললেন—বহুত আচ্ছা। কিন্তু এইবার ভাই বাস্ করো। এইবার আমি ধরব।

হেসে ভেটকী বললে—কিন্তু মনে রেখো সে বনে মানুষ কোথাও নাই। এমন কি ধারেকাছেও নাই। না মুনি, না ঋষি, না ব্যাধ, না মৃগয়ারত রাজা রাজপুত্র, না কাঠকুড়ুনী, না ডাইনী, না পরী, কেউ না। বুঝেছ?

ত্রিকালদাদু বললেন—না। নাই। সে বনে নানান পাখী, নানান জন্তু—কিন্তু হাতী পর্যন্ত। ব্যাস। বাঘ নাই, সিংহ নাই।

—মানে?

—গল্পের মানে নাই। বনে মানুষ নাই তুমি বলে দিয়েছ কিন্তু বাঘ সিংহ আছে তা বলনি। তার আগেই গল্পটা ধরে নিয়েছি। মানে—তখন বিধাতা পুরুষ মাটির পৃথিবী গড়েছেন, গাছপালা লাগিয়েছেন, পাখী ছেড়েছেন, হরিণ বুনোমোষ নামটা কি বললি ভাই?

—বাইসন্।

—হ্যাঁ বাইসন্ গড়েছেন, নেকড়ে গণ্ডার হাতী গড়েছেন। বাঘ গড়েন নি, সিংহ গড়েন নি, মানুষ, বনে কেন, পৃথিবীর কোথাও নেই, মানে গড়েন নি। বনেও নেই—যেখানে সমতল পৃথিবী সবুজ ঘাসে ভরা—নদী বইছে কুলকুল করে—সেসব জায়গায় শুধু ঘাস, আগাছা—আর তার মধ্যে কীটপতঙ্গ আর ছোট ছোট জানোয়ার খরগোস, ইন্দুর, টিকটিকি, গিরগিটী, সাপ, ব্যাঙ।

ইঞ্জিনীয়ার বেজোর দিকে তাকিয়ে বললে—ছুঁচো গড়েছেন।

বেজো তৎক্ষণাৎ বলে উঠল—বাঁদর গড়েছেন।

—হ্যাঁ। রাত্রে ছুঁচো কিচকিচ করে—দিনে বাঁদরেরা খ্যাঁক খ্যাঁক করে। আর কোলাহল কোলাহল কোলাহল। কলহ কলহ কলহ। ক্ষুধার খাদ্য নিয়ে কলহ, আশ্রয়ের স্থান নিয়ে কলহ, লজ্জা করিসনে ভাই ভেটকী, মেয়েদের উপর অধিকার নিয়ে কলহ; কলহ থেকে যুদ্ধ, তর্জন থেকে গর্জন, প্রচণ্ড গর্জন, প্রবল আর্তনাদ; পৃথিবীর বুক পদভরে থরথর করে কাঁপে, সপ্ত-স্তরের আকাশলোকে নীলাভ শান্তি-সুষমা ক্ষণে ক্ষণে চমকে ওঠে; বিধাতাপুরুষের দুয়ারে আছড়ে গিয়ে পড়ে ঝড়ের সমুদ্রের ঢেউয়ের মত। বিধাতা বসে মৃদু মৃদু হাসছিলেন খুব আত্মতৃপ্ত হয়েই, বুঝেছ না, অর্থাৎ কি সৃষ্টিই করেছি আমি। এবং ভাবছিলেন এইবার একছিলম দা-কাটা তামাক মৌজ করে সেবন করে নাসিকায় সর্ষপ তৈল সিঞ্চন করে বেশ একটি লম্বা দিবানিদ্রা দেবেন। বেশ পরিশ্রম হয়েছে, অনেক তৈরী করেছেন তো! মানে উৎপাদন। এখন মেশিন চালু হয়ে গেছে দিব্যি, ফুল থেকে ফল হচ্ছে, ফল থেকে বীজ, বীজ থেকে অঙ্কুর, ওদিকে পতঙ্গে-পাখীতে পাড়ছে ডিম, ডিমে দিচ্ছে তা, ডিম ফেটে হচ্ছে বাচ্চা, জন্তুর হচ্ছে ছানা; সে তো ভাই ইঞ্জিনীয়ার তোদের কলের ব্যাপার, টিপে দিলি বিজলীর বোতাম, ঘুরতে লাগল কল—এপাশে দিলি তুলোর গাঁট—ওপাশে বেরিয়ে এল কাপড় হয়ে।

ইঞ্জিনীয়ার বললে—এত সোজা নয় ত্রিকালদাদু, একটা কলে হয় না—

—হল রে হল। এখানেও কি ব্যাপার একটা রে? অনেক। ক্ষিদের কল—কামের কল—তার আবার উপকল—ধর গিয়ে গন্ধের কল, রূপের কল—শব্দের কল—অনেক কল রে। সে ইঞ্জিনীয়ারিং হয়তো তোর মাথায় ঢুকছে না; বোঝাতে গেলে গল্প মোড় ফিরে টালীগঞ্জ যাবার কথা—টালায় চলে যাবে। শুধু ইশেরায় বলি ভাই—নাতবউ সাজগোজ ক'রে গন্ধতেল দিয়ে কেমন

নতুন ছাঁদে খোঁপা বাধে, আবার পাউডার মাখে—সেণ্টোও ফোঁটা দুই গায়ে যখন ঢালে তখন নিচেরতলা থেকে মন তোর উপরতলায় ছোটে না? যাক্, ও-কথা ওইখানেই থাক। এখন যা বলছিলাম। বিধেতাপুরুষ হাই তুলতে তুলতে বলতে যাচ্ছিলেন—মিছেরাম তামাক সাজ বেটা! হঠাৎ ওই প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠলেন; হাই তুলতে গিয়ে তোলা হল না—হাঁ করে চোখ ছানাবড়া ক'রে বসে রইলেন—হাতের তুড়ি হাতে রইল, নধর ভুঁড়ির ভেতর ওই শব্দের প্রতিধ্বনি উঠল।

—অশ্লীল হয়ে যাচ্ছে দাদু। বললে সন্তু।

—তুই ভাই নেহাত একালের রসিক; সব কালের নয়।

—কেন?

—তা হলে ওটা অশ্লীল ভাবতিস না। ওর মানেটা কলিক বেদনা উঠল ভাবতিস। তাতেই তো শুদ্ধ, না কি?

বেজো বললে—ব্র্যাভো ত্রিকালদাদু! ওয়াণ্ডারফুল!

দাদু বললেন—বেঁচে থাক ভাই। একসঙ্গে তুই শান্তি শান্তি বলেও চেঁচাস—আবার ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জয় রক্তবিপ্লব বলতে প্যারিস—তুই ঠিক বুঝেছিস। তারপর শোন। মিছেরাম হুঁকো হাতে আসতেই বিধাতা বললেন—ও কি রে?

—কি?

—ওই চীৎকার? সর্বনাশ, বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গ হবে যে! মহাদেবের গাঁজার মৌজ ভাঙলে রক্ষে থাকবে না।

মিছেরাম বললে—তোমার কীর্তি। ছিষ্টি করেছ—সেখানে মারামারি-কামড়াকামড়ি-রক্তারক্তি—এ ওকে ধরে খাচ্ছে—ও এর গর্ত গুহা কেড়ে নিচ্ছে—এ ওর পরিবার নিয়ে টানাটানি—তা নিয়ে খুনজখম; আবার কোন কারণ নেই এ ওকে দেখলে গর্জন করে আক্রমণ করছে—এই ব্যাপার! মানে তোমার ছিষ্টি কিসের জন্যে করেছিলে জানি না—

—চোপরও বেকুব! কিসের জন্যে? আনন্দের জন্যে।

—তা—আনন্দ কোথায় বলতো ঠাকুর?

—কেন? শান্তিতে?

—তবে এত অশান্তি যেখানে, সেখানে আনন্দ কোথায় বল? তোমার ছিষ্টির মানে পাল্টে গেছে। ব্যাকরণে তোমার ভুল হয়েছে।

বিধাতা একবার তাঁর স্টুডিয়োর বাইরে এসে শো-রুম মানে পৃথিবীর দিকে চারটে মুখ চারদিকে ফিরিয়ে বারোটা চোখে—মানে দেবতাদের তিনটে চোখ—তিন চারে বারোটা, বারোটা চোখে দশ দিক দেখে নিলেন। তারপর বললেন—নিয়ে আয় তো ক্ষিত্যপতেজমরুদব্যোমের বেশ একটা ভাল তাল। নিয়ে আয়!

মিছেরাম বললে—আবার উপদ্রব ছিষ্টি করবে?

—মিছেরাম!

—বড্ড রেগেছ তুমি। তোমার কচ্ছ খুলে গেছে। এখন থাক।

—মূর্খ! সৃষ্টি প্রেরণা! নিয়ে আয় উপাদানের তাল।

মিছেরাম আর আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে সাহস করলে না। সেও রাগ করে একতাল উপাদান এনে খপ্ করে ফেলে দিয়ে বললে—ওই নাও!

বিধাতা গড়তে বসে গেলেন। গড়লেন—এক জীব। গতি দিলেন—বিক্রম দিলেন—শক্তি দিলেন—সব চেয়ে ধারালো নখ দিলেন—দাঁত দিলেন, তেজ দিলেন, ক্রোধ দিলেন, মহাগর্জন দিলেন—তারপর রঙ দিলেন—উজ্জ্বল হলুদ রঙ—তার উপরে—পাশেই পড়েছিল পোড়া তামাকের গুল—কি খেয়াল হল—চার আঙুলে সেই তামাকের গুলের কালি নিয়ে টেনে দিলেন ডোরা দাগ! তারপর গন্ধ। গায়ে দিলেন—বিকট উগ্রগন্ধ। অর্থাৎ যাকে দেখলে ভয় হয়, যার গর্জনে ভয় হয়, যার গায়ের

গন্ধে ভয় হয়—যার তেজে অভিভূত হতে হয়, যার শক্তির আঘাতে মৃত্যু হয় মুহূর্তে, তেমনি এক জীব। অন্য জীব দূরের কথা, হাতীর মাথাও যার দাঁতে নখে ভেঙে যায়, তেমন ভয়ঙ্কর বলশালী।

জীবটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল—হো-হুম? অর্থাৎ কো-হং! হুঁম—গরর? অর্থাৎ কিংকরব?

বিধাতা বলবেন—তুমি ব্যাঘ্র। জীবেদের মধ্যে সব থেকে বলশালী বিক্রমশালী হলে তুমি। জীব জগতে বড় কলহ—সকলে শক্তিমদে মত্ত হয়ে মারামারি করছে। তুমি সব চেয়ে বলশালী—এদের তুমি শাসন করবে। তোমার ভয়ে সব শান্ত থাকবে। যাও।

বাঘ মারলে এক লাফ। এবং সঙ্গে সঙ্গে দিলে হুঙ্কার। পড়ল এসে ঝপ করে বনের মধ্যে, এবং পড়বি তো পড় এক দাঁতাল হাতীর মাথায়।

তারপর সে এক প্রলয় কাণ্ড! চীৎকারে এত দিন আকাশ-লোকের সপ্ত স্তরের শান্তি ব্যাহত হচ্ছিল—এবার দ্বাদশ স্তর পর্যন্ত থরথর করে কাঁপতে লাগল! সর্বনাশ! এর চারটে স্তর পরেই অর্থাৎ ষোড়শ স্তরে গোলকে বিষ্ণু এবং তার চার স্তর পরেই রুদ্র।

ব্রহ্মা তাকিয়ে দেখলেন—হাতী, গণ্ডার, নেকড়ে, হরিণেরা পরস্পরের সঙ্গে কলহে দ্বন্দ্বে রক্তারক্তিতে যে ভীষণতার এবং যে মর্মান্তিকতার সৃষ্টি করেছিল ব্যাঘ্র একা তার থেকে বহু গুণে বেশী ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করছে। তার শক্তি, তার তেজ, তার বিক্রম, প্রচণ্ড হিংসায় সে প্রায় রুদ্র তাণ্ডবের সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেছিলেন শাসন করতে; কিন্তু শাসনের মধ্যে রক্তশোষণের আস্বাদনে সে মহাহিংস্রক হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর অণুপরমাণুতে বিচিত্র সংযম ও শৃঙ্খলায় প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি মনোহর ছন্দে নৃত্যরতা

মনোরমা রূপ ধারণ করে আনন্দ উল্লাসকে পরমানন্দে শান্ত ও সমাহিত করে মানসসরোবরের মত অক্ষয় অমৃত হ্রদে পরিণত করেছেন—যে অমৃতের কল্যাণেই সৃষ্টির স্থায়িত্ব; সেই শক্তি জীব-দেহের মধ্যে চেতনা পেয়ে, গতি পেয়ে, প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সে শুধু লোভে ক্ষোভে কামে ক্রোধে ধ্বংসের উল্লাসে রঙ্গিণীর মত তাণ্ডব নৃত্যে নিজেকে ক্ষয় করতে শুরু করছে। থাকবে না। এ সৃষ্টি থাকবে না। কিন্তু চিন্তার অবসর নাই। অবিলম্বে ব্যাঘ্রকে দমন করতে না পারলে—গেল, সৃষ্টি গেল। বসে গেলেন তিনি আবার সৃষ্টি করতে। বাঘকে দমন করতে হবে। উপাদানের তাল নিয়ে চলতে লাগল তাঁর হাত। অত্যন্ত ক্ষিপ্রবেগে। অভ্যাস বশে—অভ্যস্ত হাতে আবার তৈরী হল এক চতুষ্পদ। বাঘের চেয়েও শক্তিশালী—অবয়বে আকৃতিতে তার থেকেও ভীষণরূপে গাম্ভীর্যশালী। নখর দন্ত তার চেয়েও প্রখর। গলায় তার পুঞ্জ পুঞ্জ কেশর, চোখে তার অগ্নিময় দ্যুতি—কণ্ঠে তার বজ্রনাদী গর্জন। বললেন—তুমি সিংহ। তুমি বাঘের স্বৈরাচারকে দমন করে পশুরাজত্ব লাভ কর। যাও! সিংহ বনভূমে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলহ কোলাহল আরও প্রবল হয়ে উঠল। লোক পিতামহ বুঝলেন, সিংহ এবং ব্যাঘ্র দ্বন্দ্বযুদ্ধে উপস্থিত হয়েছে। দমন কার্য চলেছে। যাক, এবার শান্তি ফিরবে। ওঁ শান্তি!

হঠাৎ যেন সব টলমল করে উঠল। কি হল? তাকিয়ে রইলেন—পৃথিবীর বুকের উপর রূপময়ী প্রাণশক্তির দিকে। কীট-পতঙ্গ থেকে ব্যাঘ্র সিংহ পর্যন্ত জীবকুলের মধ্যে যে রূপ ব্যক্ত হয়েছে, তার উপর।

দেখলেন—জীবদেহের মধ্যে সেই শক্তি ভয়ঙ্করতর আক্রোশ উল্লাসে—অট্টহাস্য করছে। সমগ্র জীবকুলকে পৃথকভাবে না দেখে অখণ্ডরূপে দেখলে—মুহূর্তে বুঝা যায় যে, নিজের দেহে নিজেই

সে দংশন করছে, এবং সেই রক্ত পান করে সে উন্মাদিনী আত্মঘাতিনী হতে চায়। সে কি বিভীষিকাময়ী মূর্তি জীবনময়ী মহাশক্তির! দেখলেন—নেকড়ে যা করেছিল—গণ্ডার যা করেছিল, জলে কুম্ভীর যা করে, বাঘ যা করছে, সিংহও তাই করছে। প্রচণ্ড চীৎকারে নখ-দন্তের শস্ত্রে রক্তের নদী বইয়ে দিয়েছে।

ঠিক এই সময় শ্যামাভ জ্যোতিতে ব্রহ্মলোকের রক্তাভ শোভা বিচিত্ররূপে মনোহর এবং স্নিগ্ধতর হয়ে উঠল। উদ্বিগ্ন মধুর কণ্ঠের বাণী ধ্বনিত—পিতামহ!

—বিষ্ণু!

আবির্ভূত হয়েছেন বিষ্ণু।—হ্যাঁ পিতামহ। এ কি হচ্ছে? আনন্দ কোথায় গেল? আকাশের স্তরে স্তরে, লোকে লোকে, লোক লোকান্তর থেকে আনন্দ যে পৃথিবীতে সূর্যাস্তের সঙ্গে আলোকের বিলীন হওয়ার মত বিলীন হয়ে যাচ্ছে!

—কি করব বিষ্ণু। আনন্দের বশে—চেয়েছিলাম আকারহীন অবয়বহীন—আনন্দময়ী শক্তিকে সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে, পৃথিবীকে বর্ণে-গন্ধে-শব্দে-স্পর্শে, অরূপকে রূপে প্রকাশ করব। অব্যক্তকে রূপে রসে অপরূপে ব্যক্ত করব। কিন্তু এ কি হল? চেয়ে দেখ সৃষ্টির দিকে!

বিষ্ণু বললে—দেখেছি পিতামহ! তাই তো বলছি এর উপায় করুন!

—উপায় তো একমাত্র ধ্বংস বিষ্ণু! সে উপায় তো আমার হাতে নয়। সে তো রুদ্রের হাতে। তিনি নিশ্চয় জাগছেন। বলতে বলতে পিতামহ ব্রহ্মার চোখেও দুটি বিন্দু জল এল—গড়িয়ে পড়ল—অবশিষ্ট উপাদান পিণ্ডের উপর।

—আপনি কাঁদছেন পিতামহ?

—মমতায়! এ যে আমারই সৃষ্টি বিষ্ণু! ধ্বংস হয়ে যাবে?

—না। সৃষ্টি আপন গতি পেয়েছে। সে গতিতে সে আপনি চলবে। যেটুকু অসম্পূর্ণ আছে সেইটুকু আপনি শেষ করুন।

খানিকটা উপাদান তো এখনও অবশিষ্ট রয়েছে দেখছি। ওটুকুতে আর কি করবেন করুন—তারপর আপনার দায় শেষ।

—আবারও সৃষ্টি করব? কি করব? শক্তিমানের পর মহাশক্তিমানের সৃষ্টি করে অশান্তি দেখ। আবার সৃষ্টি!

—না করে তো উপায় নেই আপনার। উপাদান যতক্ষণ অবশিষ্ট ততক্ষণ আপনাকে কাজ করতেই হবে। কে জানে এ অশান্তি অসম্পূর্ণতার জন্য কিনা? সম্পূর্ণ করুন।

ব্রহ্মা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বিষ্ণুর দিকে। ওদিকে হাত চলতে লাগল। গড়লেন, নকল করলেন—বিষ্ণুর মূর্তির দুই হাত দিয়ে আর দুই হাত দিতে যাচ্ছেন কিন্তু—; এ কি! একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন ব্রহ্মা। বিষ্ণু বললেন—কি হল?

ব্রহ্মা বললেন—আর উপাদান নেই। সব নিঃশেষ। মাত্র একটি বিন্দু অবশিষ্ট আছে—তাতে তো আর দুটি হাত হবে না।

—না হোক। চার হাত হলে ও দেবতা হয়ে যেত। আপনার মাটির পৃথিবীতে ওকে মানাতো না। ও-ও যেতে চাইত না, থাকতে চাইত না। স্বজাতির প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ অবয়বে এবং আকারে। ওরা আমাদের মত হয়েও আমাদের মত নয়; উপাদানেও নয় আকারেও নয়। কিন্তু ওই একতিল উপাদান যে বেঁচেছে পিতামহ। ওটুকু ওর কোথাও দিয়ে দিন।

ব্রহ্মা নূতন সৃষ্টির সর্বাঙ্গের দিকে চেয়ে দেখলেন। তাইতো এই তিলটিকে কোথায় দেবেন? দিলেই যে বাহুল্যের খুঁত হয়ে যাবে। হাতে তিল পরিমাণ উপাদান!

স্থান আছে এক বক্ষগহ্বরে আর মাথায় করোটির অভ্যন্তরে। উদরে স্থান নেই, সেখানে শক্তি ক্ষুধারূপিণী হয়ে গহ্বরটি পূর্ণ ক'রে আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরের অগ্নির মত জ্বলছে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেখানে ধকধক করছে, সেইখানে আছে, স্থান আছে। আর মাথার মধ্যে আছে। দু'ভাগে ভাগ করলেন, সেই তিলটিকে।

কিন্তু বড় শক্ত হয়ে গেছে। কি করে তাকে নরম করবেন? জল কোথায়? কমণ্ডলু উপুড় করলেন, কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই। ওঃ, দুই চোখের পাতা এখনও একটু একটু অশ্রুর সজলতায় সিক্ত হয়ে আছে। সেই সিক্ততাটুকু অতি সন্তর্পণে আঙুলের ডগায় নিয়ে, একটি ভাগকে নরম করলেন এবং হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বললেন—হৃদয় দিলাম তোমাকে! তারপর অবশিষ্ট অর্ধতিল। আর জল নাই। চোখের পাতাতেও নাই। মহাশিল্পী বিধাতা —বিষ্ণুর চৈতন্যময় জ্যোতির কাছে সেটুকুকে ধরলেন, সেই জ্যোতির প্রাণময় উত্তাপে সেটুকু গলে নরম হল। সেটুকু মাথার মধ্যে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণু বললেন—পিতামহ দেখুন দেখুন, নূতন সৃষ্টি আপনার কাঁদছে। ব্যথা দিয়েছেন আপনি।

নূতন সৃষ্টি বিষণ্ণ হেসে বললেন—না। পৃথিবীর ওই যন্ত্রণার চীৎকারে আমার বুকের ভিতরটা টনটন করছে। তাই কাঁদছি। হে পিতামহ! যে করুণায় তুমি সৃষ্টি ধ্বংস হবে বলে কেঁদেছিলে—আমি হৃদয় দিয়ে সেই বেদনা অনুভব করছি।

বিষ্ণু বললেন—পিতামহ তোমার সৃষ্টি বাক্য বলছে।

সৃষ্টি বললে—হে বিষ্ণু! তোমার চৈতন্য তোমার দীপ্তির উত্তাপ আমার মাথায় চেতনার স্তরে স্তরে সঞ্চারিত। স্বরব্যঞ্জনায় বিচিত্র হয়ে বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। আমি বোধশক্তি পেয়েছি!

বিষ্ণু বললেন—তুমি সেই চৈতন্য বলে বোধিকে প্রাপ্ত হও। যাও পৃথিবীতে। পৃথিবীর অরণ্যের মধ্যে তমসাচ্ছন্ন ওই আদিম জীবনের মধ্যে, উন্মত্ত নৃত্যে উন্মাদিনী প্রাণশক্তিকে নূতন রূপে প্রকাশ কর। লোভরূপিণীকে তপস্বিনী কর, ক্রোধরূপিণীকে অক্রোধরূপিণীতে পরিণত কর, ভয়ঙ্করীকে অভয়া রূপে ব্যক্ত কর; কামরূপিণীকে প্রেমময়ীত্বে অভিষিক্ত কর, মৃত্যুভীতা অথচ মৃত্যু উৎসবে তাণ্ডব নৃত্যরতাকে অমৃত তপস্যায় রত কর।

মানুষ এল সেই অরণ্যে।

সে অরণ্যের বৃক্ষলতা থেকে জীব-জগতের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে তাদের অঙ্গের উত্তাপে, প্রবৃত্তির প্রভাবে—সর্বত্র এক মহামোহ। অন্ধকারের স্পর্শে, বায়ুর স্পর্শে, মাটির স্পর্শে সেই মহামোহ সঞ্চারিত হয়।

ত্রিকালদাদু বললেন—ভাই কখনও সুরা-বিপনীতে গিয়েছ? সেখানে ঢুকলে যেমন মুহূর্তে আচ্ছন্নতা ঘিরে ধরে, ঠিক তেমনি মানুষ সেখানে এসে আচ্ছন্ন হয়ে গেল ওই জীবজগতের মত ওই ধর্মে।

আশ্রয় করলে সে বৃক্ষশাখা গুহা-গহ্বর।

নখ দাঁত তারও বড় হল। প্রখর হল। অস্ত্র আবিষ্কার করলে সে, গাছের ডাল, বড় বড় পাথরের চাঁই। চতুর পশুর মত বসে থাকল। উদরের মধ্যে আগ্নেয়গিরির মত ক্ষুধারূপিণী দাউ দাউ করে জ্বলছে। চোখের দৃষ্টিতে তার প্রতিফলন। এল একটা হরিণ। ঝপ ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঘাত করল পাথর দিয়ে এবং কাঁচা মাংস খেতে লাগল রাক্ষসের মত। হরিণটার অন্তিম আর্তনাদ ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গিয়ে আছড়ে পড়ল।

ব্রহ্মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। হায়! হায়! হায়! সব ব্যর্থ!

আবার একটা আর্তনাদ!

এবার সে একটা বাঘকে মেরেছে পাথরের আঘাতে। অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুঁড়েছিল।

আবার আর্তনাদ! এবার সিংহ পড়েছে একটা গর্তের মধ্যে এবং মানুষ তাকে খুঁচে খুঁচে মারছে।

আবার আর্তনাদ। এবার মর্মান্তিক। ওঃ! এবার মানুষ অন্য একটা মানুষকে মেরেছে। একটা বাঁশের আঘাতে। একটা বাঁশকে সে অস্ত্র করেছে। মৃত মানুষটার সঙ্গে ছিল একটি মানুষী, মানুষকে হত্যা করে সে মানুষীকে বেঁধে গুহার মধ্যে নিয়ে যাচ্ছে।

সব ব্যর্থ! সব ব্যর্থ! হে বিষ্ণু!

—পিতামহ! স্মরণ মাত্রেই বিষ্ণু এসেছেন।

—সব ব্যর্থ বিষ্ণু, সব ব্যর্থ!

—তাই তো পিতামহ! বলতে বলতে একটি সুর কানে এসে ঢুকল। বিষ্ণু সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখুন দেখুন, পিতামহ দেখুন!

—কি দেখব?

—সুর শুনছেন না? এখন দেখুন।

তাই তো, এ তো পরম বিস্ময়! জ্যোৎস্নালোকে ওই মানুষীটিকে পাশে নিয়ে বসে—লোকটি সেই বড় বাঁশটার একটা খণ্ড কেটে নিয়ে বাঁশী করে তাতে সুর তুলেছে!

আহা—হা!

পরের দিন বিষ্ণু নিজেই ছুটে এলেন—পিতামহ! দেখুন পিতামহ—দেখুন!

ব্রহ্মা দেখলেন—পরমাশ্চর্য!

ওই লোকটি একটি পাকা ফল সংগ্রহ করে খাবার উপক্রম করে মুখের কাছে তুলেও খাচ্ছে না। স্থির দৃষ্টিতে কি দেখছে।

ব্রহ্মা দেখলেন—একটু অন্ধকারের মধ্যে একটি অতি দুর্বল—অতি ক্ষুধার্ত মানুষ পড়ে আছে। তার উঠবার শক্তি নাই। কিন্তু কি ক্ষুধার্ত দৃষ্টি তার চোখে! মানুষটি তাকে দেখছে। দেখতে দেখতে সে এগিয়ে গেল তার দিকে। ব্রহ্মা বুঝলেন—ওকে হত্যা করে শত্রু নিঃশেষ করে তবে খাবে। কিন্তু না তো! এ কি পরম বিস্ময়! লোকটি তার মুখের ফলটি তার হাতে দিয়ে বললে—তুমি খাও!

দু'জনের চোখেই জল পড়ল। দুই লোকেই। স্বর্গ লোকে পড়ল ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুর—মর্ত লোকে পড়ল দু'টি মানুষের!

তারপর আরও বিচিত্র কথা।

একা মানুষ—দশের সঙ্গে মিলল। এক একটা এলাকার মধ্যে

দেশ গড়লে। বহু বিবাদ, বহু মতান্তর, তবুও আশ্চর্য, বিবাদ করে ব্যথা পায়। খতিয়ে দেখে কার অন্যায়! নিজের হলে ক্ষমা চাইবার জন্য ব্যগ্র হয়, চাইতে সব সময় পারে না, কিন্তু পারলে মনে হয় মানসসরোবরে স্নান করে দেহ স্নিগ্ধ হল। কেউ আবার ক্ষমা না চাইতেই ক্ষমা করে। মধ্যে মধ্যে আকাশের স্তরে স্তরে তখন আপনি ধ্বনি ওঠে—ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি! ওঁ শান্তি!

তবু অশান্তির শেষ নাই।

মনের ভিতর বনের অন্ধকার কেটেও কাটে না।

হৃদয় ভালবাসতে যায়—কিন্তু পারে না; রাধার অভিসারের পথে যেমন জটিলা কুটিলা চোখ পাকিয়ে দাঁড়িয়ে বলত—কোথায় যাবি লা বউ? খবরদার! তেমনি করেই বাধা দেয়—স্বার্থ আর অবিশ্বাস! মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে জটিলা—আর বুদ্ধির মধ্যে থাকেন কুটিলা। হৃদয় কাঁদে রাধার মত!

মানুষের সঙ্গে মানুষের দেখা হয়, শুধু পরিচয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে চোখের দরজায় অবিশ্বাসের ছায়া পড়ে, জটিলা উঁকি মারে। কুটিলা পিছন থেকে বলে—বউ লো, ঘরের দরজা বন্ধ কর। খবরদার। তারপর ডাকে—দাদা গো, খেঁটে নিয়ে বেরিয়ে এস।

হুঙ্কার দিয়ে বেরিয়ে আসে—গায়ের জোরের দাদা।—কে—রে? চোর?

তাই যুদ্ধ বেধে যায় মানুষ-মানুষে। সে বনের প্রথম যুগের অন্ধকার তাদের ঘিরে ধরে। মানুষে মানুষে যুদ্ধ হয়, মানুষের দলে দলে যুদ্ধ হয়। একদল আর একদলকে দাস ক'রে ভাবে এই তো পেয়েছি এদের। হৃদয়ের ধর্মে সে তাকে আপনার করেই চায়, না করলে বুকে তার অশান্তির আগুন জ্বলে, সে সেই জ্বালায় অন্যকে জোর করে দাস ক'রে পেয়ে খুশী হতে চায়—ভাবে—এই তো পাওয়া হল। কিন্তু তা হয় না।

একদল মানুষ ভাবে। কেন? কেন এমন হচ্ছে? একদল

ছাড়ে না। তারা বনের দিকে তাকিয়ে বলে—এই তো নিয়ম। এমনি করেই তো সিংহ-বাঘ-হাতী বনের মধ্যে এতকাল কাটিয়ে এসেছে! এই তো স্ব-ভাব!

যারা ভাবে তারা বের করলে—ন্যায়ের পথে শান্তি, অন্যায়ের পথে অশান্তি! তারা হল সুর।

যারা মানলে না—তারা হল অসুর। তাদের মধ্যে বনের অন্ধকার বিষ্ণুর চৈতন্য দীপ্তিকেও নিষ্প্রভ করে দিলে। পশুর স্বভাব হল তাদের স্ব-ভাব। কত যুদ্ধ হল সুরে-অসুরে। কিন্তু সুর হারিয়ে দিলে অসুরদের। তারপর আবার একদল অসুর হল রাক্ষস। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হল মানুষদের। রাক্ষসেরাও হারল।

তারপর শুধু মানুষ।

শান্তির জন্য সে সংসার ছেড়ে নির্জনে—বনে পাহাড়ে গিয়ে বসল। কোলাহল নাই—কলহ নাই; স্তব্ধতার প্রশান্তি! এই শান্তি! আকাশলোকের নীল মহিমার দিকে তাকিয়ে সন্ধান করতে চাইলে—কোথায় ওখানে শান্তির প্রবাহ উদাস বৈরাগ্যে বেয়ে যাচ্ছে! কত তপস্যা!

কোথায় শান্তি? মনে তার মহিমার প্রকাশ হয় কই? একজনের মনে হয় তো সমাজের জীবন, জগতের জীবনে তার প্রকাশ কই?

জগতের জীবনেও চলে সঙ্ঘর্ষের মধ্যে দিয়ে তারই তপস্যা। অন্যায়কে দমন ক'রে, অন্যায়কারীকে নাশ ক'রে, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করার মহা আয়োজন করে সে। কুরুক্ষেত্র হয়। অধার্মিককে নাশ কর, ধার্মিককে সুপ্রতিষ্ঠিত কর; ধর্মের মধ্যে ন্যায়ের মধ্যে শান্তি, শান্তি মহনীয় মহিমায় প্রকাশিত হবে—বর্ষান্তে শরতের আকাশের নীলের মত, শরতের শস্য-শ্যামলা কোমলা ধরিত্রীর বুকের মত।

তাতেও হয় না। অধার্মিকের নাশ হয়—অধর্মের নাশ হয় না।

সে যায় না। শাসনে সে শীতের ভুজঙ্গের মত বিবরে আত্মগোপন করে থাকে; আবার শাসনের দুর্বলতায় শাসকেরই মানসলোক থেকে উত্তপ্ত ঋতুর ভুজঙ্গের মত নির্মোক ত্যাগ করা নাগের মত বেরিয়ে ফণা তুলে দাঁড়ায়।

সে বিষনিঃশ্বাস আকাশের সকল স্তরে জর্জরতার তরঙ্গ তোলে। ব্রহ্মাও তার স্পর্শে জর্জরিত হয়ে চোখের জল ফেলে বলেন—সব ব্যর্থ হল! হায় মানুষ!

বিষ্ণু এসে দাঁড়ান।—পিতামহ!

—বিষ্ণু! আমার সঙ্গে কাঁদতে এসেছ? না আমার ব্যর্থতায় রহস্য করতে এসেছ?

—না পিতামহ। পৃথিবীর নতুন সংবাদ এনেছি।

—ধ্বংস হচ্ছে পৃথিবী? অশান্তির উত্তাপ অগ্নি হয়ে জ্বলে উঠেছে?

—না। এক রাজপুত্র গৃহত্যাগ করে শান্তির সন্ধানে গিয়েছিল—

—সে তো বহু মুনি ঋষি তপস্বী গৃহত্যাগ করে—পৃথিবীতে শান্তি নেই—শান্তি মৃত্যুর পরপারে ঘোষণা ক'রে স্বর্গলোকে এসেছে। আর একজন আসবে। তাতে শান্তি কোথায়? আমার বেদনা তাতে বাড়ে বই কমে না বিষ্ণু!

—না পিতামহ; সে চৈতন্যকে দীপ্ততর করেছে, বোধ তার বোধিতে পরিণত হয়েছে। সে সেই বোধি নিয়ে স্বর্গে না এসে —ফিরে গেল মানুষের মধ্যে। সব মানুষ শান্তি না পেলে তার শান্তি নাই। নিজের স্বর্গপথকে রুদ্ধ ক'রে ফিরল। ওই শুনুন কি বলছে। নূতন বাণী পিতামহ। এই বাণীই যেন আমার অন্তরে অন্তরে এতদিন ভাষাহীন সঙ্গীত রাগিণীর আলাপের মত ঝঙ্কার তুলেছে। পিতামহ ফুলের গন্ধের মধ্যে এই বাণী যেন ঘুমিয়ে ছিল, রূপের মধ্যে সুষমার মত আভাসে ব্যক্ত ছিল। আজ সে প্রকাশ পেল —পিতামহ ওই শুনুন।

ব্রহ্মা কান পেতে শুনলেন।

অপরূপ বাঙ্ময় সঙ্গীত উঠছে—আকাশের স্তরে স্তরে তার প্রতিধ্বনি মূর্ছনা হ্রদের জলের উপর মৃদু বায়ু হিল্লোলে কম্পনের মত কম্পন বয়ে যাচ্ছে।

'বাণীময় সঙ্গীত !—নহি বেরেন বেরানি
সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মতি এস ধম্ম
সনন্তনো।'

সে সঙ্গীত বেজেই চলেছে। বেজেই চলেছে। কখনও কম, কখনও বেশী। পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে কত অশান্তির ঝড় উঠল; কত হিংসা চীৎকার করে উগ্র হয়ে উঠল—আবার নিস্তেজ হল।

এরই মধ্যে মানুষের শান্তির তপস্যা সমানে চলেছে।

মহাপ্রকৃতি একে একে রূপ থেকে রূপান্তরে চলেছেন। মহামসী-বর্ণা উলঙ্গিনী কালী থেকে শুভ্র হয়ে হলেন নীলাভ বর্ণা ব্যাঘ্রচর্ম পরিহিতা তারা।

তারপর হলেন ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।

আবার হলেন ছিন্নমস্তা—ধূমাবতী ! হবেন কমলা।

মানুষের মধ্যেই হবেন। শান্তিকে সৃষ্টির রূপ দেবার জন্যই মানুষের সৃষ্টি। সে চৈতন্য এবং হৃদয় নিয়ে এসেছে। তার মহাপ্রকাশ হবেই।

ইঞ্জিনীয়ার এবার আর থাকতে পারলে না। বললে—হ্যাঁ। হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে—শান্তির তরে নাচে রে ! এই সব বাজে গল্প আর বলবেন না। রাম নামের জন্যে গান্ধী এ যুগে চলল না। মরে ভূত হয়ে গেল।

ভেটকী বললে—ও কথা বলো না মেজদা! গান্ধী তো ভূত হয়ে আছে। স্টালিন মরে ভূত হয়েও রেহাই পায়নি। তাঁর ভূতকেও তাড়িয়ে ছেড়েছে!

ইঞ্জিনীয়ার বললে—আমি গান্ধীকেও মানি না। স্টালিনকেও মানি না। জহরলালকে প্রধান মন্ত্রী হিসেবে মানি—নইলে তাঁকেও মানি না। গান্ধীর শান্তি চরকা। স্টালিনের শান্তি—আয়রন কার্টেন, জহরলালের শান্তি—হাতী। আইসেনহাওয়ার ক্রুশ্চেভের শান্তি খাস অ্যাটম বোমা। পড়ে শান্তি আসবে। ত্রিকালদাদুর ব্রহ্মা মন্ত্র পড়াবেন—বিষ্ণু শ্রাদ্ধ করবেন। শ্রাদ্ধ শেষে পিণ্ডিভাগ করে সরিয়ে বলবেন, পিণ্ড গয়্যং-গচ্ছ গয়্যং-গচ্ছ! ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি। সমস্ত পৃথিবীটাই তখন ধূলো হয়ে সূর্যের চারিদিকে একটা আণবিক কুহেলিকার মত হিল্ হিল্ ক'রে কাঁপবে!

ত্রিকালদাদু হেসে বললেন—না। তা হবে না। সংসারে কেউ মিথ্যা নয়। ওরা সবাই সত্য। মানুষ সত্য যে!

ভেটকী বললে—ওর সঙ্গে কথায় পারবেন না। ও নাস্তিক। আপনি গল্পটা শেষ করুন দাদু!

দাদু বললেন—এ গল্পের শেষ নেই ভাই। এ গল্প চলছে। শেষ হবে মানুষের মধ্যে মহাশক্তির কমলা রূপের মহাপ্রকাশে! সেই লক্ষ্য। ভেটকী ভাই, তুই আমাকে শুনিয়েছিলি, তোর তো রবি-কবির বাণী কণ্ঠস্থ। শুনিয়ে দে তো—সেই যে—মহাপ্রয়াণের কিছুদিন আগে লিখেছিলেন। সেই যে—'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ—'

সন্তু চোখ বুজে শুনছিল—সেই বলে গেল—ভেটকী তার সঙ্গে যোগ দিলে—'সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ—'

ত্রিকালদাদুর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

চোখ মুছে বললেন—রবীন্দ্রনাথ গান্ধীর সেই এক সঙ্গে ছবিটা কই ভাই—প্রণাম ক'রে রবিবারের আসরের পালাটা শেষ করি! গল্পে যদি মন না উঠে থাকে ভাই তবে বুড়ো বলে ক্ষমা-ঘেন্না ক'রে নিস। আরে ইঞ্জিনীয়ার তোমার চোখে পড়ল কি? কচলাচ্ছ যে?

—কুটো পড়েছে দাদু!*

* একটি রবিবারের সকালের মজলিসের আলাপের অনুলিপি। গল্প নয়।

# হেড মাস্টার

ছাত্রেরা পিলপিল করে বেরিয়ে গেল ইস্কুল থেকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোটা ইস্কুল-বাড়িটা শূন্য হয়ে গেল, খাঁ-খাঁ করে একটা শূন্যতা। শিক্ষকেরা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলেন। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃদ্ধ হেডমাস্টার চন্দ্রভূষণবাবু।

ছ' ফুট লম্বা শীর্ণদেহ সোজা মানুষ, চোখে স্থির পলকহীন দৃষ্টি ; বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত দীর্ঘ মিছিলে সারিবন্দী সাড়ে তিনশো ছেলের গতিপথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পাঁচ বছরের শিশু থেকে ষোল-সতের বছরের ছেলের দল। চীৎকার করছে : আমাদের দাবী—

—মানতে হবে।

চন্দ্রভূষণবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। নিজের কানে শোনা ওই শব্দগুলির অর্থ যেন তিনি উপলব্ধি করতে পারছেন না।

ছেলের দল কম্পাউণ্ড থেকে বের হয়ে রাস্তা ধরে চলে গেল। হেডমাস্টার মশায় সিঁড়ির মাথা থেকে ফিরলেন। ছ' ফুট মানুষটির পদক্ষেপ স্বাভাবিক ভাবেই চিরকালই দীর্ঘ। একটু সামনে ঝুঁকে লম্বা পা ফেলেই তিনি হাঁটেন। বারান্দার কোলেই ইস্কুলের হল। সারিবন্দী চারিটি চার ফুট বাই আট ফুট দরজা ; একটা দরজার মুখে এসে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। মাস্টার মশায়দের দেখতে পেলেন। চৌদ্দ জন মাস্টারদের মধ্যে চারজন ছাড়া সকলেই তাঁর ছাত্র। হেডপণ্ডিত কিশোরীমোহন কাব্যবেদান্ততীর্থ তাঁর থেকে বয়সে

বৎসর দুয়েকের বড়, মৌলবী সাহেব জনাব জিয়াউদ্দিন খান তাঁর সমবয়সী; আর দু'জন বিদেশ থেকে এসেছেন; বয়সে তরুণ, তাঁরা তাঁর ছাত্র নন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে তিনি কিছু বলতে চাইলেন কিন্তু থেমে গেলেন, ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠল; তিনি মুখ ঘুরিয়ে আবার অগ্রসর হলেন। হলের মধ্যে ঢুকলেন।

বিস্তীর্ণ হল। চারটি চারফুট দরজায় ষোল ফুট এবং ছ'টি দরজার মধ্যে পাঁচটি ও দু'পাশে দু'টি ছ'ফুট দেওয়ালে বেয়াল্লিশ ফুট মোট আটান্ন ফুট লম্বা-চওড়া আটাশ ফুট হলে পাশাপাশি তিনটে ক্লাশ শূন্য পড়ে রয়েছে, খাঁ-খাঁ করছে। ওপাশের দেওয়ালে মার্বেল ট্যাবলেট গাঁথা রয়েছে। দরজার মাথায় মাথায় ছবি টাঙানো রয়েছে। পশ্চিম দিকের চওড়া দেওয়ালটার মাঝখানে ক্লকটা চলছে—ঘরখানা এমনি স্তব্ধ যে ক্লকটার পেণ্ডুলাম চলার শব্দটাই একমাত্র শব্দ হয়ে উঠেছে; অবিরাম শব্দ উঠছে টক্‌টক্‌, টক্‌টক্‌, টক্‌টক্‌। কতদিন ছুটির পর এমনই শূন্য স্তব্ধ হলের মধ্য দিয়ে তিনি হেঁটে চলে গেছেন—কত ছুটির দিন প্রয়োজনে এসে তিনি এই হল দিয়েই লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুকেছেন কিন্তু কোনদিন এমন স্পষ্টভাবে তিনি ঘড়ি চলার শব্দ শুনতে পাননি। তিনি থমকে দাঁড়ালেন; মনে পড়ে গেল আর একদিনের কথা। তাঁর একমাত্র পুত্রের মৃত্যু-দিনের কথা। উনিশশো সাঁইত্রিশ সাল—ষোল বছর আগে তাঁর চব্বিশ বছরের ছেলে ব্রজকিশোর যেদিন মারা গিয়েছিল সেই দিনের কথা। ব্রজকিশোরের শেষকৃত্য সেরে বাড়িতে ফিরে ব্রজকিশোরের ঘরে ঢুকেছিলেন। বাড়িতে তিনি একা; দশবছরের ব্রজকিশোরকে রেখে তার মা মারা গিয়েছিল, কাঁদবারও কেউ ছিল না। ব্রজকিশোরের ঘরখানায় তার জিনিসপত্র যেমন সাজানো তেমনিই ছিল; টেবিলের উপর সেদিন ব্রজর টাইমপিস্‌টা ঠিক এমনি ভাবে শব্দ করছিল। না; শব্দ ঘড়িটা বরাবরই করত, কতদিন ব্রজর অনুপস্থিতিতে তার ঘরে ঢুকে বই এনেছেন, বই রেখে এসেছেন, এই তো অসুখের

সময়েও তিনি বসে থেকেছেন ব্রজর পাশে—ঘড়িটা ঠিক এইভাবেই শব্দ করে চলেছে, শব্দ করাই ওর ধর্ম; কিন্তু শব্দটা কানে ঠেকত না; সেদিন ঠেকেছিল; এই আজকের মত ঠেকেছিল। অথবা সেদিনের মতই ঠেকেছে আজকের শব্দটা।

কাছে এসে দাঁড়ালেন হেডপণ্ডিতমশায়। চলুন আপিসে, চলুন মাস্টার—। মশাইটা আর মুখ থেকে বের হল না তাঁর। চন্দ্রভূষণবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি থেমে গেলেন। চন্দ্রভূষণবাবুর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে।

তাঁর জীবনের তপস্যার সকল পুণ্য এই ইস্কুলকে দিয়েছেন তিনি। তার অকাল-মৃত্যু হবে না। মনে মনে ভাবতেন, ব্রজকিশোরের বিয়ের সময় একটি মনোহর উৎসব করবার গোপন অভিপ্রায় তাঁর মেটেনি, নবগ্রাম ইস্কুলের জয়ন্তী উপলক্ষে সে সাধ মেটাবেন তিনি।

অনেক বাঁশী অনেক কাঁসী অনেক আয়োজন তিনি করবেন। কিন্তু অকস্মাৎ তার সকল কল্পনা বিপর্যস্ত হয়ে গেল। ছেলেরা ধর্মঘট করে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে চলে গেল; বলে গেল—তাঁকে তারা মানে না, বলে গেল—তিনি অত্যাচারী, বলে গেল—তাঁর ধর্মকে তারা চায় না!

তারা ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে। তারা জানিয়ে দিয়ে গেল—তাদের ধর্মকে না মানলে তারা তাঁকে পরিত্যাগ করবে।

হেডপণ্ডিতমশায় ডাকলেন কেষ্টকে। কেষ্ট, অরে অ কেষ্ট!

সত্তরের কাছাকাছি বয়স কেষ্টর। ইস্কুলের ঘণ্টা বাজিয়ে সে আফিস-ঘরের দরজার পাশে টুলে বসে ঘুমোয়। বসে বাস ঘুমানো কেষ্টর অভ্যেস হয়ে গেছে। আজ সে পার্সী ক্লাসের জানালার গরাদে ধরে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল; এটা কি হল? এ কি কাণ্ড? হে ভগবান! চন্দ্র মাস্টারের সামনে দিয়ে তার হুকুম ডোণ্টোকেয়ার করে ছেলেগুলো চলে গেল?

হেডপণ্ডিতের ডাক শুনে সে সাড়া দিয়ে পার্শী ক্লাস থেকে বেরিয়ে হলে এসে দাঁড়াল।—আজ্ঞে!

পণ্ডিতমশায় বললেন—হলের দরজাগুলো বন্ধ কর বাবা!

এতক্ষণ পর্যন্ত চন্দ্রভূষণবাবু নির্বাক হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন—শুধু মৃদুস্বরে পণ্ডিতমশাইকে একবার বলেছিলেন—ব্রজকিশোরের মৃত্যুদিনের কথাটা মনে পড়ে গেল পণ্ডিতমশায়। ওই ঘড়িটার টক্‌টক্ শব্দ শুনে। সকরুণ মৃদু কণ্ঠস্বর। সে কথাগুলি কোন ধ্বনি তোলেনি, ঘড়িটার পেণ্ডুলামের শব্দ একটুও ঢাকা পড়েনি; পণ্ডিতমশায় ছাড়া আর কেউ শুনতেও পায়নি।

এবার হলের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনি বলে উঠলেন—না।

হলখানা গমগম করে উঠল। না—। ঘড়ির শব্দ আর শোনা গেল না। সূক্ষ্ম মাকড়সার জালের মত হলখানার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত নিস্তব্ধতার জালখানা অকস্মাৎ যেন দু'টুকরো হয়ে কেটে গুটিয়ে গেল।

চন্দ্রভূষণবাবু বললেন—না। ইস্কুল খোলা থাকবে। ইস্কুল চলবে। আপনারা যে যার ক্লাসে গিয়ে বসুন। কেষ্ট, যেমন তুই ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিয়ে থাকিস—দিয়ে যাবি! ইস্কুল চলবে।

এগিয়ে এলেন সেকেণ্ড মাস্টার—বললেন—কিছু মনে করবেন না মাস্টারমশাই, একটা কথা বলব।

—বলুন।

—আপনি ইনষ্টিটিউশনের হেড, আপনার কথা আমাদের মানতেই হবে। কিন্তু তাতে ফল কি হবে? সারাটা দিন শূন্য ক্লাসে বসে না হয় আমরা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলাম, কি বই পড়েই কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু সেটা হাস্যকর হবে না দেখতে?

চন্দ্রভূষণবাবু তার দিকে তাকিয়ে রইলেন স্থির দৃষ্টিতে। গৌরবর্ণ, তরুণ, দীপ্ত চোখ, মাথার চুলগুলি রুক্ষ; ধারালো নাক, ঠোঁটের রেখায় রেখায় কি যেন একটা চাপা অভিপ্রায় অবরুদ্ধ হয়ে রয়েছে, প্রশস্ত

কপালের ঠিক মাঝখানে দুটি ভুরুর মধ্যস্থলে একটি সূক্ষ্ম কুঞ্চন দেখে মনে হয়, সে অভিপ্রায় ক্ষুব্ধ, সে অভিপ্রায় অপ্রসন্ন, সে সঙ্কল্প রূঢ়।

চন্দ্রভূষণবাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি আমার সঙ্গে আপিসে আসুন সীতেশবাবু। আপনারা—। অন্য মাস্টারদের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনারা ক্লাসে যান।

বলেই অভ্যাসমত দীর্ঘ পদক্ষেপে তিনি এসে আপিস ঘরে ঢুকলেন। তাঁর নিজের চেয়ারখানি দেখিয়ে দিয়ে বললেন—বসুন।

সীতেশবাবু হেসে বললেন—আপনি আমাকে সন্দেহ করেছেন? এ ধর্মঘটে আমি উৎসাহ দিয়েছি! কথা শেষ করে তিনি আবারও একটু হাসলেন।

চন্দ্রভূষণবাবু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—সন্দেহ নয় সীতেশবাবু, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাই। এ ধর্মঘট আপনি করিয়েছেন।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন সীতেশবাবু। তারপর বললেন—হ্যাঁ করিয়েছি। অবশ্য একা আমি নই। আপনার প্রাক্তন ছাত্র এখানকার মাননীয় ব্যক্তিও আছেন।

—তাও জানি। কিন্তু ছেলেদের নিয়ে যে খেলা খেলছেন—তাতে তাদের ক্ষতির কথা ভেবে দেখেছেন?

—খেলার কথা নয় মাস্টারমশাই। খেলা আমরা করিনি। খেলা করেছেন আপনি। আপনিই তাদের খেলনা ভেবেছেন। কিন্তু তারা তা নয়।

—খেলনা তাদের আমি কখনও মনে করিনি সীতেশবাবু। তারা দেশের ভবিষ্যৎ, তারা আমার কাছে সবাই ব্রজকিশোর। তাদের মানুষ, সত্যকারের মানুষ করে গড়ে তুলতে চাই। আজ ঊনপঞ্চাশ বছর ইস্কুল হয়েছে। প্রথম এ ইস্কুল যখন গড়ে তোলা হয় তখন মাধববাবুর কাছে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে থেকেছি। তাঁকে টাকা খরচ করতে রাজী করিয়েছি। এখানকার সমাজপতিদের দোরে দোরে ঘুরেছি। মাটির ঘর তুলে ইস্কুল হল প্রথম। নিজে

দাঁড়িয়ে থেকে মজুর খাটিয়েছি। এ ইস্কুল আমার হাতের গড়া। এখানকার ষাটের নীচে যাদের বয়স—তারা আমার ছাত্র। তাদের জিজ্ঞাসা করে আসুন, তারা বলবে—আমার কাছে তারা সন্তান ছিল, খেলনা ছিল না। কোন দিন তা' ভাবিনি। আজও ভাবিনে।

—তা হলে সেকালের ছেলেরা সত্যিই খেলনার মত নির্জীব ছিল। তাই তাদের নাড়াচাড়া করে ছেলেদের খেলনা ভাবা আপনার অভ্যাস হয়ে গেছে মাস্টারমশাই। আজকাল কাঠের পুতুলেরা কালধর্মে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠেছে। আপনার অভ্যস্ত ধরনের নাড়াচাড়া তারা সহ্য করতে পারছে না। তাদের একটা নতুন জাগরণ হয়েছে—তাদের আপনি খোঁয়াড়ে আবদ্ধ জানোয়ারের মত আটকাতে চাইলে থাকবে কেন?

—সেটা আপনি আসবার পর থেকেই হয়েছে সীতেশবাবু। আপনি জাগিয়েছেন তাদের।'

হেসে সীতেশবাবু বললেন—আপনি যে আমাকে কম্‌প্লিমেণ্ট দিলেন—সে আমার চিরদিন মনে থাকবে মাস্টারমশাই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

—কিন্তু এই 'ঈশ্বর না-মানা', এ জাগরণ না উন্মত্ততা? এ শিক্ষা কি আপনি দেননি?

—না।

—আমার বিশ্বাস ছিল আপনি সত্য বলতে ভয় পাবেন না।

—আমি অসত্য বলিনি।

—আপনি এসে যে ময়দান ক্লাব করেছেন—মাঠে যে ছেলেদের নিয়ে জটলা করেন, সেখানে কি নিয়মিত এই বক্তৃতা দেননি?

—দিয়েছি। কিন্তু সে ইস্কুলের বাইরে। ইস্কুলে আমি এ শিক্ষা কোন দিন দিইনি।

—আমরা কিন্তু ইস্কুলের ভিতরে এক শিক্ষা, বাইরে এক শিক্ষা কখনও দিইনি সীতেশবাবু।

—সত্য শিক্ষা যখন ইস্কুলে দেওয়া নিষিদ্ধ হয় মাস্টারমশাই, দেওয়ার যখন উপায় থাকে না—তখন ইস্কুলের ভিতরে মিথ্যা শিক্ষা দেওয়ার প্রায়শ্চিত্ত এ ভাবে ছাড়া করার উপায় কি? আমি অন্যায় করিনি।

—সত্য বাদ দিয়ে সত্য শিক্ষা? হাসলেন চন্দ্রভূষণবাবু।—ঈশ্বর বাদ দিয়ে সত্য?

—আপনার সঙ্গে তর্ক করব না মাস্টারমশাই। ছেলেদের দাবী আপনি মেনে নিন। নইলে এ স্ট্রাইক মিটবে না।

—রিলিজিয়াস ক্লাস—স্তোত্রপাঠ এ আমি উঠিয়ে দেব না। নেভার!

—অপশেনাল করে দিন।

—না। তাও দেব না। তাতে ইস্কুল উঠে যায়—উঠে যাক।

—তা হলে হয়তো শেষ পর্যন্ত—। হাসলেন সীতেশবাবু—হাসির ইঙ্গিতের মধ্যেই শেষ পর্যন্ত কি হবে সে কথাটা উহ্য রয়ে গেল।—আমি ক্লাসে যাচ্ছি। বলে হাসতে হাসতে সীতেশবাবু বেরিয়ে চলে গেলেন।

* * * *

হেডপণ্ডিতমশায়ের পায়ের শব্দে তিনি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়েছিলেন। পণ্ডিতমশায় মৃদুস্বরে বললেন—কাঁদছেন আপনি? চোখের চশমাটা খুলে চোখ মুছে চন্দ্রভূষণবাবু ঈষৎ হেসে বললেন—ব্রজকিশোরের মৃত্যু-দিনের কথাটা মনে পড়ে গেল পণ্ডিতমশায়। সন্ধ্যেবেলা তার ঘরে ঢুকেছিলাম—এমনি সাজানো ঘর-দোর—শুধু কেউ ছিল না, আর ওই ঘড়িটার মত সেদিনও টাইমপিসটা টিক্‌টিক্ করে চলছিল।

পণ্ডিতমশায় আবার বললেন—চলুন, আপিসে চলুন। বলেই তিনি ডাকলেন—কেষ্ট—ওরে, অ কেষ্ট।

কেষ্ট মণ্ডল ইস্কুলের পুরানো চাকর। হেডমাস্টার হেডপণ্ডিত মৌলবীর সমসাময়িক। পণ্ডিতমশায় রসিকতা করে বলেন—যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ। অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য যতদিন—কেষ্ট আমার ততদিন।

মৌলবী জিয়াউদ্দিন বলেন—ওরে বামনা—তা হলে বলছিস তুই চন্দ্র আর হেডমাস্টার সূর্যি—আর আমিটা বুঝি কেউ নই? আমিও যে তোদের বয়সী রে বামনা!

পণ্ডিতও মৌলবীকে গাল দেন। বলেন—ওরে দেড়েল মামদো—বয়সে এক হলে কি হবে—তুই যে অনেক পরে এসেছিস। পারসী কেলাস পাঁচ বছর পরে হয়েছে। আমাদের সঙ্গে তোর সঙ্গ?

পণ্ডিত এবং মৌলবীতে এমনি গাঢ় প্রীতির রস মাখানো ঝগড়া চিরকাল চলে আসছে। টিফিনের সময় কল্কেতে ফুঁ দিত কেষ্ট, মৌলবী বলতেন—এই কেষ্ট, বামনাকে আগে দিবি না। উ টানলে আর কিছু থাকবে না!

পণ্ডিত হুঙ্কার দিতেন—খবরদার দাড়িয়াল মামদো! তুই তামাক খেতে পাবিনে। তুই তামাক খাবি কি?

—কেন রে মাকুন্দা তিলক-মার্কা বামনা—তামাক খাব না কেন?

—ওরে মুখ্যু তোকে তামাক খেতে নেই। বিচার করে দেখ না।

—শুনি তোর বিচারটা।

—শুনবি?

—বল।

—তুই মরে গোরে যাবি কিনা?

—হাঁ যাব।

—আমি মরে চিতায় পুড়ব কিনা?

—পুড়বি। তোর চিতের আগুন নিভবে না বামনা। তোদের রাবণের মত। সে আমি বলে দিলাম।

—নিশ্চয়। হরদম তামাক সাজব আর খাব রে দেড়েল। আমাকে সেই জন্যেই তামাক খেতে আছে। তুই যাবি গোরে—কোথায় পাবি আগুন? কি করে তামাক খাবি? খাসনে, বদ অভ্যেস করিসনে; মরবি, মামদো হয়ে পেট ফুলে ঢোল হয়ে উঠবে তোর।

কেষ্ট হাসত।

চন্দ্রভূষণবাবুই কেষ্টকে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর গ্রামের লোক কেষ্ট। কেষ্ট মণ্ডল। স্কুল হয়েছে আজ ঊনপঞ্চাশ বৎসর। ঊনপঞ্চাশ বৎসর আগে চন্দ্রভূষণবাবু এসেছিলেন এখানে সেকেণ্ড মাস্টার হয়ে। সঙ্গে এসেছিল কেস্ট। কিশোরীমোহন কাব্যতীর্থ তখন শুধু কাব্যতীর্থ—হেডপণ্ডিত হয়েই এসেছিলেন। আগামী বৎসর ইস্কুলের পঞ্চাশ বৎসর—গোল্ডেন জুবিলী—সুবর্ণ জয়ন্তী; কিশোরীমোহন পণ্ডিত, কেষ্ট এবং মৌলবী জিয়াউদ্দিন সেই অপেক্ষাতেই আছেন; জয়ন্তীর সময়েই অবসর নেবেন। চন্দ্রভূষণবাবুও হেডমাস্টারের পদ থেকে অবসর নেবেন কিন্তু আচার্য হয়ে থাকবেন; তাঁর জন্য নূতন পদের সৃষ্টি হবে। আগেকার আমল না হলে আচার্য না বলে বলত সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। জয়ন্তীর আয়োজন চলছে। পুরানো ছাত্রদের ঠিকানা যোগাড় করে চিঠি লেখা হচ্ছে। ঊনপঞ্চাশ বছরে তো কম ছাত্র এই ইস্কুলে পড়েনি! অন্তত কয়েক হাজার। চাঁদা তোলা হচ্ছে। একটি সাধারণ সভা ডেকে জয়ন্তী কমিটি তৈরি হয়েছে, কয়েকটি সাব কমিটি গঠিত হয়েছে। অনেক আয়োজন।

চন্দ্রভূষণবাবুর প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেননি। তাঁর কাব্য তখন তিনি পড়েননি, পড়েছেন পরবর্তী জীবনে। এবং বৃদ্ধ বয়সেও সে কাব্য তিনি কণ্ঠস্থ করবার চেষ্টা করেছেন। জয়ন্তীর আয়োজনের প্রথম দিন থেকেই তাঁর মনে একটি লাইন গুনগুন করছে—

'অনেক বাঁশী অনেক কাঁসী অনেক আয়োজন।'

করতে হবে, করতে হবে; অনেক কষ্টে গড়ে তুলেছেন নবগ্রাম হাই ইংলিশ স্কুল—এখনকার নাম নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ। ব্রজকিশোর মারা গেছে, নবগ্রাম ইস্কুল বেঁচে আছে; নবগ্রাম ইস্কুল তাঁর আর এক সন্তান। যাক— তাই যদি উঠে যায়—তাই যাক।

ব্রজকিশোর মরে গেছে—নবগ্রাম বিদ্যাপীঠও উঠে যাক। সত্তর বছর বয়সে তাও সইবে। কিন্তু রিলিজিয়াস ক্লাস আর স্তোত্রপাঠের ব্যবস্থা তিনি তুলে দিতে পারবেন না। কখনও না। নিজের হাতে প্রাণপাত পরিশ্রমে তিনি এই ইস্কুল গড়ে তুলেছেন।

১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গের বৎসর। একুশ বছরের সদ্য ডিষ্টিংশনে বি-এ পাশ চন্দ্রভূষণবাবু সরকারী চাকরি খোঁজেন নি—নবগ্রামে এসে ইস্কুল করবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। গড়ে তুলেছেন, ঊনপঞ্চাশ বৎসর তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন—পরিপুষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। ইস্কুলের প্রথম দিন থেকেই ইস্কুল বসবার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্তোত্রপাঠের ব্যবস্থা আছে।

গীতার বিশ্বরূপ স্তোত্র—

'ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥

ইস্কুলে এখন সাড়ে তিনশো ছাত্র। একটা হলে সব ছেলেদের সঙ্কুলান হয় না, সেই জন্যে স্কুলের মাঠে ছেলেরা দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়—মাস্টাররা দাঁড়ান সামনে স্কুলের সিড়ির উপর; চারটি ছেলে এই স্তোত্র গান করে—বাকী ছেলেরা তাদের পরে সমস্বরে সেই স্তোত্র গান করে যায়। চন্দ্রভূষণ চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। সমস্ত দিনের জন্য মনের তারে সুর বেঁধে নেন। ১৯০৫ সালে ইস্কুলে কোন মুসলমান ছাত্র ছিল না। সাত সাল থেকে মুসলমান ছাত্র

ভর্তি হতে আরম্ভ হয়েছিল। তারা এতে কোন আপত্তি জানায়নি; তারা তখন পারসী পড়ত না, সংস্কৃত পড়ত। দশ সাল থেকে পারসী ক্লাস আরম্ভ হয়েছে, জিয়াউদ্দিন এসেছেন দশ সালে। জিয়াউদ্দিন শুধু পারসী জানেন না—তিনি সংস্কৃতও জানেন। তিনিও আজ পর্যন্ত এ ব্যবস্থায় আপত্তি জানাননি। মুসলিম লীগ আমলে মুসলমান ছাত্রেরা আপত্তি জানিয়েছিল, তাতে জিয়াউদ্দিন বলেছিলেন —ওরে বাবা, পঞ্চামৃত দিয়ে হিঁদুরা ঈশ্বরের ভোগ দেয়। তাতে দুধ থাকে, দই থাকে, মধু থাকে, ঘি থাকে, চিনি থাকে—সে কি ঈশ্বরের ভোগ দিয়েছে বলে—অখাদ্য হয়? খেলে বিস্বাদ লাগে? না—দেহের ক্ষেতি করে? ও যখন খেতে মিঠা তখন খেয়ে নে।"

ছেলেরা শোনেনি, রাগ করেছিল মৌলবীর উপর। নাম দিয়েছিল—জেয়াউদ্দিন ভট্‌চাজ। সে সময় চন্দ্রভূষণবাবু মুসলমান ছেলেদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা করেছিলেন, তখন থেকে তারা আলাদা অন্য জায়গায় কোরানের প্রার্থনা মন্ত্র পাঠ করে আসছে।

আর রিলিজিয়াস ক্লাস; শনিবার স্কুলের নিয়মিত ক্লাসের পর আধ ঘণ্টা ধর্মসভা বা রিলিজিয়াস ক্লাস হয়। হিন্দুরা আলাদা—মুসলমানদের আলাদা। এ ব্যবস্থা ষোল বছরের। ব্রজকিশোরের মৃত্যুর পর থেকে। ব্রজকিশোরের মৃত্যুর আঘাত তিনি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। পৃথিবী শূন্য মনে হয়েছিল। জীবন অর্থহীন নিরর্থক ভেবেছিলেন, পৃথিবীর আলো নিভে গিয়েছিল, তিক্ত ছাড়া স্বাদ ছিল না পৃথিবীতে, কটু ছাড়া গন্ধ ছিল না, দুঃখ ছাড়া আর কিছু ছিল না সৃষ্টিতে। ইস্কুলে এসে বসে থাকতেন—চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ত, ক্লাসে পড়াতে গিয়ে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যেতেন—মিনিট দুই পরে উঠে চলে আসতেন, আপিসে এসে তখনকার সেকেণ্ড মাস্টারকে পাঠিয়ে দিতেন—'আপনি যান ননীবাবু—আমি পারছি না। পারলাম না।'

সেই সময় গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন। মহাকবির কাছে গিয়েছিলেন—জিজ্ঞাসা করেছিলেন সান্ত্বনা কিসে? কোথায়?

মহাকবি পুত্র-শোকাতুর প্রৌঢ়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—আনন্দের ধ্যানে।

বুঝতে পারেননি চন্দ্রভূষণবাবু। পরদিন প্রভাতে উপাসনা মন্দিরে ছিল একটি বিশেষ উপাসনা। কবিগুরু সেদিন নিজে গিয়েছিলেন। চন্দ্রভূষণবাবুকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

গানে আরম্ভ।

সে গান আজও তাঁর মনের তারে অহরহ ঝঙ্কৃত হচ্ছে।

'তোমারই সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ—সুরের বাঁধনে—

তুমি জান না।—

তোমারে পেয়েছি অজানা সাধনে॥'

আনন্দের সন্ধান—আনন্দের ধ্যানমন্ত্র চন্দ্রভূষণবাবু সেইখানে বসেই পেয়ে গিয়েছিলেন। উপাসনার পর মহাকবির পায়ে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে বলেছিলেন—আমি পেয়েছি। ধ্যানমন্ত্র ধ্যানপদ্ধতি আমি পেয়েছি। ফিরে এসে তিনি শনিবার স্কুলের পর শান্তিনিকেতনের উপাসনা-আসরের অনুকরণে এই ধর্মসভার প্রবর্তন করেছিলেন। গান দিয়েই আরম্ভ। তারপর হিন্দুর উপনিষদ পুরাণ, ইসলামের কোরান, ক্রীশ্চানের বাইবেল থেকে কিছু কিছু পাঠ করা হয়।

এতকাল পরে ছেলেরা বলেছে—এ ব্যবস্থা চলবে না।

বিদ্রোহ করছে তারা।

তাদের কয়েকজন নিঃসংশয়ে না কি জেনেছে—ঈশ্বর নেই। তাদের সে কথা জানিয়েছেন—নিঃসংশয়ে বুঝিয়েছেন এই নবীন বিদেশী শিক্ষকটি। সেকেণ্ড মাস্টার সীতেশবাবু।

এই তো মাসখানেক আগে ছোট একটি ছেলে—দশ এগার বছরের শিশু—কাঁদো-কাঁদো মুখ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাঁর কোয়ার্টারের বাইরের ঘরের দরজায় উঁকি মারছিল। চন্দ্রভূষণবাবু ইস্কুলে যাবার জন্য তৈরি হয়ে তামাক খাচ্ছিলেন চেয়ারে

বসে। ছেলেটির দিকে চোখ পড়তেই ছেলেটি সরে গেল। যেন ভয় পেয়েছে।

হেডমাস্টার তিনি। গাম্ভীর্য তাঁকে অভ্যাস করতে হয়েছে। গাম্ভীর্য তাঁকে রাখতে হয়। দীর্ঘ ঊনপঞ্চাশ বছরের প্রথম দু' বছর তিনি ছিলেন সেকেণ্ড মাস্টার, তারপর তিনিই হয়েছিলেন হেডমাস্টার। তেইশ বছর বয়সের হেডমাস্টার সাতচল্লিশ বৎসর আগে। তখন ফার্স্ট সেকেণ্ড ক্লাসের ছাত্রদেরই অনেকের বয়স ছিল ঊনিশ কুড়ি। স্কুলের দ্বিতীয় বৎসরে বরদা পণ্ডিত এণ্ট্রান্স দিয়েছিল; নর্ম্যাল পাশ করে বরদা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে এসেছিল; বরদার বয়স ছিল চব্বিশ। বরদা দাড়ি রেখেছিল, বড় বড় দাড়ি গোঁফ নিয়ে সে ক্লাসে বসে থাকত। চণ্ডীপুরের দুই ভাই নলিন আর নরেন ঊনিশ বছর বয়সে দাড়ি গোঁফ নিয়ে মাইনর পাশ করে এসে ভর্তি হয়েছিল ফোর্থ ক্লাসে। শম্ভু, ষষ্ঠি, ফুরু, গুলু, হিমাংশু, ভোলা, হলা, নবীন এই নবগ্রামের বর্ধিষ্ণু ঘরের ছেলে; ব্রাহ্মণ ভূসম্পত্তিবান্, কুলধর্মে তান্ত্রিক, আবার ইংরাজী ফ্যাশনে ঘাড় চেঁচে চুল ছাঁটত—একটার জায়গায় দুটো সিঁথি চিরে টেরী কাটত। সেই সব ছেলেদের শৃঙ্খলাধীনে রাখতে তাঁকে গাম্ভীর্য অভ্যাস করতে হয়েছিল। নিজের দীর্ঘ দেহের জন্য তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেন। একে বয়স অল্প, তার উপর যদি তিনি মাথায় খাটো হতেন—তবে অভ্যাস করলেও গাম্ভীর্য তাঁকে মানাত না। হেডমাস্টার হয়ে তিনি দাড়ি রেখেছিলেন। গোঁফ সেকালে কেউ কামাত না। কাপড় কামিজ কোট ছেড়ে তিনি চোগা-চাপকান পরতেন। তাতে আরও লম্বা দেখাত, আরও গম্ভীর মনে হত। স্কুলের প্রথম ঘণ্টাতেই তিনি বের হতেন একবার। দীর্ঘ পদক্ষেপে প্রতিটি ক্লাসে একবার ঢুকতেন। প্রতিটি ক্লাস দেখে আপিসে ফিরে আসতেন। গাম্ভীর্য যা একদিন আবরণ ছিল, মুখোস ছিল—সেইটেই আজ জীবনে আসল চেহারায় দাঁড়িয়ে গেছে।

সেকালে ব্রজকিশোর যখন ইস্কুলে ভর্তি হল ছেলে বয়সে তখন সে বাড়ী এসে তাঁকে বলত—ইস্কুলে আপনাকে দেখে এমন ভয় লাগে!

হেসে বেশ একটু অহঙ্কার অনুভব করেই তিনি বলিতেন—লাগে?

—বড্ড ভয় লাগে!

এবার সশব্দে হেসে উঠতেন তিনি। কিন্তু একটু শব্দ করে হেসেই নিজেকে সংযত করতেন। ছেলের যদি ভয় ভেঙ্গে যায়, সে যদি ইস্কুলেই আবদার করে পিতৃস্নেহ দাবী করে অন্যদের চেয়ে বেশী—তবে সে যে অপরাধ হবে তাঁর! ইস্কুলের ক্ষতি হবে।

আজ বৃদ্ধ বয়সে প্রাণটা কেমন করে। ব্রজকিশোর বেঁচে থাকলে—তাঁর ছেলেদের নিয়ে খানিকটা ছেলেমানুষী করতেন। তাঁর গাম্ভীর্যের মুখোসটা—যেটা অহরহ পরে থেকে থেকে—আসল মুখেই পরিণত হয়ে গেল, সেটা তারা টান মেরে ছিঁড়ে দিতে পারত!

একটু সকরুণ হাসি দেখা দিল মুখে।

পারত কি? তারাও কি ইস্কুলে পড়ত না? অন্ততঃ ইস্কুলে যাওয়ার সময় তারাও ঠিক এই শিশুটির মতই সঙ্কুচিত হ'ত।

ছেলেটি আবার উঁকি মারলে। মুখখানি যেন কেমন কেমন! তিনি ডাকলেন—কেষ্ট!

কেষ্ট তাঁর বই খাতা গুছিয়ে নিচ্ছিল। সে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে—আজ্ঞে!

—দেখ তো একটি ছেলে—উঁকি মারছে। চশমা নেই ঠিক চিনতে পারলাম না। কিন্তু মনে হ'ল—মুখখানা শুকনো শুকনো। হয়তো শরীর খারাপ করেছে—কি বাড়ীতে কিছু হয়েছে—ছুটি চায়—দেখ তো!

কেষ্ট বেরিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে নিয়ে এল।

সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। মুহূর্তে চিনলেন—এবার আপার প্রাইমারি থেকে বৃত্তি পেয়ে ক্লাস ফাইভে এসে ভর্তি হয়েছে—

এই গ্রামেরই শ্যামাদাসের ছেলে সুকুমার। শ্যামাদাস তাঁর ছাত্র। অকৃতী ছাত্র। কিন্তু এ ছেলেটি উজ্জ্বল—এ ছেলে কৃতী হবে—সে ছাপ যেন ওর মুখে লেখা আছে। সুন্দর আবৃত্তি করে, সুন্দর গান করে; স্তোত্র গানের ধরতাই ধরে যারা—তাদের মধ্যে সুকুমার একজন।

কেষ্ট বললে—কি বলছে বুঝতে পারলাম না। কি বলছে ঈশ্বর ঈশ্বর বলে—শুধান আপনি।

—কি রে সুকুমার? কি হয়েছে?

—স্যার—

—বল কি হয়েছে?

—ঈশ্বর নেই স্যার?

—কি? ঈশ্বর নেই? অবাক বিস্ময়ে ছোট ছেলেটির প্রশ্নটির পুনরুক্তি করা ছাড়া আর কোন উত্তরই বৃদ্ধ খুঁজে পেলেন না!

—ওরা বলছিল স্যার। বলছিল—বিজ্ঞান প্রমাণ করে দিয়েছে ঈশ্বর নাই। সেকেণ্ড স্যার অনেক বিজ্ঞান পড়েছেন—তিনি বলেছেন যারা বলে ঈশ্বর আছেন—তারা ভুল বলে নয়, মিথ্যে বলে। বলছিল —এইবার স্তোত্র পাঠ আর ধর্ম কেলাস উঠে যাবে। উঠিয়ে দেবে!

চমকে উঠলেন চন্দ্রভূষণবাবু। পা থেকে রক্ত উঠতে লাগল মাথার দিকে। বৃদ্ধ বয়সের শীতল রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠছে যেন। তিনি সুকুমারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন—বললেন—সেকেণ্ড স্যার বলেছেন? চন্দ্রবাবু হাতের নলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তুই শুনেছিস?

না স্যার। ওরা বলছিল ময়দান ক্লাবে বলেছেন। ওদের কাছে বলেছেন।

—ওরা কারা?

—ফার্স্ট ক্লাসের জীবেন-দা, ভূপেশ-দা,—

—সেকেণ্ড ক্লাসের দীপু, ফিনা,—

চন্দ্রবাবু নিজেই নামগুলি করে গেলেন। অনেকগুলি নাম।

—হ্যাঁ স্যার! আবার সে প্রশ্ন করলে—ক্লাস উঠে যাবে স্যার? ঈশ্বর নেই স্যার?

ছেলেটির করুণ মুখচ্ছবি দেখে চন্দ্রবাবুর চোখ দুটি হঠাৎ এক মুহূর্তে জলে ভরে গেল! সে জল তিনি মুছলেন না—ছেলেটির পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—না, ক্লাস উঠে যাবে না। আর ঈশ্বর নেই এ কি কখনও সত্য হয়? আমি তাঁকে বুকের ভিতর বুঝতে পারি রে। তুইও তো নিজেই বুঝতে পারছি। পারছিস নে? নইলে তোর মনে এত কষ্ট হচ্ছে কেন?

—হ্যাঁ স্যার!

—যা, স্তোত্র পাঠের জায়গায় যা। ঘণ্টা পড়বে। আমি যাচ্ছি। সুকু চলে গিয়েছিল।

জীবেন, ভূপেশ, দীপু, ফিনা, পিণ্টু, নিতু এরা। সীতেশবাবু এদের পিছনে! তিনি না-জানা নন। কিন্তু এতটা অনুমান করতে পারেননি।

কৃতী ছাত্র, উজ্জ্বল দীপ্ত চেহারা, শিক্ষকতায় অসাধারণ দক্ষতা —সীতেশের। এখানে এসেছিল সাময়িক ভাবে। পুরানো সেকেণ্ড মাস্টার অসুস্থতার জন্য ছুটি নিয়েছিলেন, ছ' মাসের ছুটি; সীতেশকে এনে দিয়েছিল—তাঁর পুরানো ছাত্র, সে এখন বিখ্যাত লোক খ্যাতনামা সাংবাদিক। সীতেশের দক্ষতা দেখে, দীপ্তি দেখে—কর্মক্ষমতা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সেকেণ্ড মাস্টার বাঁচলেন না, তিন মাসের মধ্যেই মারা গেলেন; তখন তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে সীতেশকে স্থায়ী সেকেণ্ড মাস্টার নিযুক্ত করলেন। ময়দান ক্লাব যখন সীতেশ প্রথম করেছিল—তখন তিনি খুসী হয়েছিলেন। তিনিই উদ্বোধন করেছিলেন ময়দান ক্লাবের। আশপাশের সুন্দর জায়গা আবিষ্কার করে সেখানে গিয়ে ক্লাবের

অধিবেশন হয়। আবৃত্তি হয়, গান হয়, মুখে মুখে রচনা করে অভিনয় হয়। সীতেশ বক্তৃতা করে, ছেলেরাও করে।

হঠাৎ কিছু দিন আগে তিনি অনুভব করলেন—শীতের রাত্রে ছোট্ট অগ্নিকুণ্ডটি যেটির উত্তাপ আরম্ভে প্রাণ-সঞ্জীবনী বলে মনে হয়েছিল, সেটি যেন অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ডে বিস্তার লাভ করতে উদ্যত হয়েছে।

আগুনটায় খোঁচা দিয়েছিলেন—কিশোরী পণ্ডিত।

ফার্স্ট ক্লাসের জীবেন কবিতা লেখে, গল্প লেখে। তার ধাতুরূপের খাতা সংশোধন করবার সময় খাতার পাতায় একটা কবিতার খসড়া দেখতে পেয়েছিলেন হেডপণ্ডিত। আজকালকার কবিতা তিনি বোঝেন না, ছন্দ নেই, মিল নেই—অর্থ করতে গেলে মনে হয় অথৈ জলে ডুবে যাচ্ছেন তিনি, নিজের নাম বাপের নাম—সব ভুলে যাচ্ছেন। তবুও জীবনে লিখেছে—কি লিখেছে পড়ে দেখেছিলেন। কিঞ্চিৎ রসিকতা করবার অভিপ্রায় ছিল। কিশোরী কাব্যতীর্থ রসিকতায় বিখ্যাত। কিন্তু কবিতা পড়ে তিনি হঠাৎ সোজা হয়ে বসে খাতাটা দুমড়ে টেবিলের উপর আছড়ে মাড়িতে মাড়িতে ঘষে—অল্পক্ষণ স্থির হয়ে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়েছিলেন। তারপর বলেছিলেন—

—অ বাবা গোপাল, অ জীবেন—শোন তো মানিক।

পণ্ডিত কবিতাটা দেখেছেন বা পড়েছেন এটা জীবেন বুঝতে পারেনি। সে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

—আঁ—। কাছে এস গোপাল—বুকে নিয়ে পরাণটা জুড়িয়ে নি। আহা গোপাল রে!

—কি বলছেন স্যার?

—বলছি—আমার চোদ্দ পুরুষের ছেরাদ্দ করে তোমার ছাপ্পান্ন পুরুষের মুখে ছাই দিয়ে—হ্যাঁ বাবা আমার বরাহ-গোপাল—তুমি

কোন্ পচা বিল থেকে ধম্মশালুক ফুল তুলে চিনেছ বাবা মানিক? এ কি লিখেছ? এ্যাঁ? কি?

হে নূতন যুগের মানুষ বিধাতা—
তোমার আবির্ভাবে—
ধর্মের ভণ্ডামির পালা হল শেষ।
কুৎসিৎ কুচক্রের চক্রান্তের দাঁতালো চক্রের
দাঁতগুলো ভেঙে গেল; কুবলয় হাতীর
দাঁত টেনে যেমন ভেঙেছিল কৃষ্ণ—
তেমনি তুমি দিলে ভেঙে চক্রান্তের চাকার দাঁত।
অনাচার-শোষণ পীড়ন এই দাঁতগুলো।
জেরুজালেম মক্কা কাশীর মন্দিরচূড়া
তোমার আবির্ভাবে ভেঙে পড়ল—পড়ছে—পড়বে।

আর পড়তে পারেননি। দারুণ ক্রোধে আবার টেবিলের উপর খাতাটা আছড়ে—জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোর জ্যাঠাকে পড়িয়েছি, বাবাকে পড়িয়েছি, তোর ঠাকুরদাদা আমাকে দাদা বলত। তোর ঠাকুমা এমন ভাল মানুষ—ওরে শুদ্ধাচারিণী মানুষ! অরে—অ পেল্লাদ অরে অ—বরাহ-গোপাল—ধম্মের শালুক চিনতে গিয়ে শুধু পাঁক ঘেঁটে এলি বাপ—আর ফতোয়া দিলি শালুক ফুলের গন্ধ পাঁকের গন্ধ, বর্ণ পাঁকের বর্ণ, পাঁপড়িগুলোও পাঁকের? বলিহারি বাপ—কুলকজ্জল—বৈজ্ঞানিক-গবেষণাটা করেছিস ভাল; ওরে ও বরাহ—তোর ঠাকুরদাদার বাবা যে পণ্ডিত মানুষ ছিলেন—গুরুগিরি করতেন; তোর ঠাকুরদাদা ছিল পূজুরী বামুন। তোর বাপ জ্যাঠাকে পূজোর দক্ষিণে আর আতপ-বেচা পয়সায় ৼিংরিজী ক খ শিখিয়েছিল রে—মানে ইংরেজী ইংরেজী!

জীবেন থৈ হারিয়ে যেন অগাধ জলে ডুবে যাচ্ছিল—প্রত্যুত্তরে কি বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না; শেষ পর্যন্ত মরিয়ার মত বলেছিল—বিজ্ঞান

মিথ্যে বলে না। সে ঠাকুরদাদাই হোক আর তার বাপই হোক —বিজ্ঞানের সন্ধানী-আলোতে তাদের সত্য চেহারাই ধরা পড়েছে।

এবার খাতাখানা পণ্ডিতমশাই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে চলে এসেছিলেন—বলেছিলেন—দাঁড়া হাত ধুয়ে আসি। পরের ঘণ্টাতেই তিনি এসে চন্দ্রভূষণবাবুকে বলেছিলেন—সর্বনাশ সমুৎপন্ন মাস্টার মশাই—অর্ধেক ত্যাগ করলেও আর রক্ষা নাই! ওটাকে তাড়ান ইস্কুল থেকে। জীব্‌নেটাকে।

চন্দ্রভূষণবাব্ হেসে বলেছিলেন—ওরা ছেলেমানুষ, আজকাল সাহিত্যে যা দেখছে—কাগজে যা পড়ছে—সেইটেই ফ্যাশনের মত অনুকরণ করছে। ও হয় তো কোন আধুনিক কবির অনুকরণ করেছে। ওর ওপর এতটা জোর দেওয়া আপনার ঠিক হয়নি।

—উঁ-হু। উঁহু! ভেবে দেখুন আপনি! ভেবে দেখুন! চলে গিয়েছিলেন পণ্ডিত নিজের ক্লাসে।

তাতেও চন্দ্রভূষণবাবু হেসেছিলেন। বিজ্ঞানের নূতন অভ্যুদয়ে খানিকটা এমন উগ্রতা খুবই স্বাভাবিক। আর জীবেন? এই তো বছরখানেক আগে জীবেন আগমনী কবিতা লিখেছিল—ইস্কুলের হাতেলেখা ম্যাগাজিনে ঃ

চিন্ময়ী তুমি মৃন্ময়ী হলে—হও মা এবার জীবন্ময়ী।

ভক্তি ও বিশ্বাসের আতিশয্য প্রকাশ পেয়েছিল সে কবিতায়। পণ্ডিতমশায় ভুল করেছেন—আকাশের রক্তাভা দেখে ঠাউরেছেন—দিগন্তে আগুন লেগেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মানুষ—ইংরিজী শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমাজের রূপান্তরে দুঃখ পেয়েছেন। মুখের উপলব্ধির আনন্দের হাসিটুকু মুহূর্তে কৌতুক হাস্যে রূপ নিয়েছিল, একটি সরস রসিকতা তাঁর মনে পড়ে গিয়েছিল,—পণ্ডিত-মশায় নিজেই এই রসিকতাটি করে থাকেন। মধ্যে মধ্যে ছেলেরা পরীক্ষার সময় কোশ্চেন কঠিন হয়েছে বলে আপত্তি করে; বেশী করে ফেল-করা ছেলেরাই। পণ্ডিত বলেন—ভাল করে অনুধাবন

করে দেখ বৎস! রক্তসন্ধ্যা—বাবারা—রক্তসন্ধ্যা। ঘরে আগুন লাগেনি। কোশ্চেনটা একটু ঘুরিয়ে দেওয়া আছে। দুবার পড়। পড়লেই দেখবে—জল অথৈ নয়—এক হাঁটু—দিব্যি পার হয়ে যাবে হেঁটে। আঃ ঘর পুড়ে পুড়ে তুই বাবাদের মন চকাভকা হয়ে আছে! জানিসতো ঘর-পোড়া গরু রক্তসন্ধ্যে দেখেই ভাবে ঘরে আগুন লেগেছে। কবার গৃহদগ্ধ হয়েছে বাবা ধূর্জটির বাহন?

মানে ষাঁড়!

ওই রক্তসন্ধ্যার উপমাটা দিয়ে রসিকতা করবার কথায় তাঁর মনে কৌতুক জেগে উঠেছিল। ঠিক এই মুহূর্তেই এসে ঘরে ঢুকেছিলেন—সেকেণ্ড মাস্টার সীতেশবাবু। তাঁর পিছনে জীবেন-ভূপেশ-দীপু-ফিনা-পিণ্টু-নিতু। সীতেশবাবুর মুখের হাসিতে কখনও ভাটা পড়ে না; ঠোঁট দুটির কিনারা পরিপূর্ণ করে হাসিটি ছলছল করে। তিনি বলেছিলেন—এই নিন মাস্টারমশাই—ছেলেরা আপনার কাছে এসেছে। ওদের মনে অত্যন্ত আঘাত লেগেছে। পণ্ডিতমশাই সাধুভাষায় ওদের কটুবাক্য বলেছেন—মানে গালাগাল করেছেন; ওদের বিশ্বাসে আঘাত করেছেন। আপনার সামনে আসতে ওরা একটু ভয় পাচ্ছিল—আমি শুনে ওদের নিয়ে এলাম। আপনি শুনুন ওদের কথা!

উপলব্ধির আনন্দ—রসিকতার কৌতুক—মুহূর্তে একটা চকিত আশঙ্কার ঝাঁকি খেয়ে যেন মিলিয়ে গিয়েছিল; মনে হয়েছিল সামনের চেয়ারে ঝুলানো তাঁর গলার পাকানো চাদরটা অকস্মাৎ সাপ হয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রয়েছে, ঝুলে থাকা মুখটার কয়েকটা সুতো বাতাসে কাঁপছে—যেন সুতো নয়—সাপটা চেরা জিভ নাড়ছে।

পরমুহূর্তে তিনি আত্মসম্বরণ করে গম্ভীরভাবে ছেলেদের বলেছিলেন—ওয়েল কাম ইন্! ছেলেরা এসে বাড়িয়ে দিয়েছিল একখানা গুড়নো ফুলস্ক্যাপ কাগজ। দরখাস্ত।

সীতেশবাবু হেসেই বলেছিলেন—আমিই বললাম—মুখে বলতে তোমাদের গোলমাল হবে—তোমরা লিখে আন। লিখেই এনেছে ওরা।

চন্দ্রভূষণবাবু তাঁর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করতে গিয়েছিলেন—আপনার ক্লাস নেই? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছিল—নেই, এ ঘণ্টা তাঁর বিশ্রাম। তিনি দরখাস্তখানি নিয়ে পড়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। দরখাস্তে শুধু অভিযোগই নাই—এ অভিযোগের প্রতিকারে তাদের দাবীও তারা জানিয়েছে। অভিযোগ—পণ্ডিতমশায়ের বলা ঘটনার থেকে অনেক বেশী। অনেক বিকৃত। এ ঘটনাই একমাত্র অভিযোগের কেন্দ্র নয়।

'পণ্ডিতমশায় বৃদ্ধ হয়েছেন—তিনি নিতান্তই সেকেলে মনোভাব-সম্পন্ন। তিনি পাঠ্যবিষয় অবহেলা করে অধিকাংশ সময় একালের সমস্ত কিছুকে ব্যঙ্গ করে গল্প বলে থাকেন। অনেক গল্প তাঁর একালের রুচিতে অশ্লীল।' এ ছাড়া আজকের ঘটনা নিয়ে অভিযোগ—'জীবেনের বিজ্ঞান-বিশ্বাসে তিনি আঘাত করেছেন। তিনি তার বাপ পিতামহ প্রপিতামহ তুলে ব্যঙ্গ করেছেন।' এবং আরও অনেক সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাগ্র অথচ সাধারণ দৃষ্টিতে ছোট অভিযোগ। "সংস্কৃত ভাষা শেখাতে গিয়ে তিনি ধর্ম্মশিক্ষা দিয়ে থাকেন; বাংলাভাষা ও সাহিত্যের নিন্দা করে থাকেন। তিনি ইংরাজী জানেন না। ফলে ইংরাজী সংস্কৃত অনুবাদে তাদের অসুবিধা হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি।" দাবী করেছে—"এর প্রতিকার চাই।" ইঙ্গিতে বলেছে পণ্ডিত-মশায়ের স্থানে তারা যোগ্যতর একালের পণ্ডিত চায়। প্রত্যক্ষ দাবী করেছে—জীবেনকে তার পিতামহ প্রপিতামহ তুলে যে ব্যঙ্গ করেছেন—তা তাঁকে প্রত্যাহার করতে হবে।

পড়তে পড়তে বৃদ্ধবয়সেও তাঁর দুই কানের পাতা গরম হয়ে উঠেছিল। সমস্ত দরখাস্তখানির মধ্যে কোথাও যেন বাঁধনের এতটুকু শিথিলতা নাই; নিপুণ গ্রন্থিতে গাঁথা, নিপুণ রচনায় রচিত, সর্বোপরি

প্রথম পংক্তি থেকে শেষপর্যন্ত কোথাও একবিন্দু বেদনা নাই, আছে ক্ষোভ,—ঔদ্ধত্য।

চোখ তুলে তিনি ছেলেদের দিকে চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখের দিকে তারা তাকাতে পারছে না, মাটির দিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তাদের অন্তরের উত্তাপ তিনি অনুভব করলেন। এমন উত্তাপ ছেলেদের মধ্যে ঊনপঞ্চাশ বছর ধরে তিনি মধ্যে মধ্যে অনুভব করেছেন। কত মতিভ্রান্ত বিকৃত প্রকৃতির ছাত্র নিয়েই না তিনি এই ইস্কুল চালিয়ে এলেন! তাদের শাসন করেছেন—নিজের অন্তরে দুঃখ পেয়েছেন। কত সময় এক একজনের আচরণে তিনি রাগে প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। আবার নিষ্ঠুর বেদনায় চোখে জল এসেছে। রাত্রে ঘুম হয়নি। নিজের ঘরের মধ্যে পায়চারি করেছেন। কিন্তু এমন দলবদ্ধ ছাত্রের যুদ্ধের আহ্বান তাঁর কাছে এই নতুন, এই প্রথম।

আবার একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—ঊনপঞ্চাশ বছরের মধ্যে আজও পর্যন্ত ইস্কুলে কখনও ছাত্রেরা বা কোন ছাত্র এই ভাবে শিক্ষকের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করেনি। তোমরা প্রথম।

ছেলেরা চুপ করেই ছিল, কোন উত্তর দেয়নি।

তিনি আবার বলেছিলেন—পণ্ডিতমশায়ের চেয়ে যোগ্য সংস্কৃত শিক্ষক অবশ্যই আছেন, কিন্তু আজও আমি দেখিনি। আজ পযন্ত এ ইস্কুল থেকে যত ছেলে সংস্কৃতে লেটার পেয়েছে—অন্য কোন বিষয়ে তত ছেলে লেটার পায়নি।

আবার তিনি বলেছিলেন—গত বছরের পরীক্ষার ফলেও তাই হয়েছে। সংস্কৃতে চারটি ছেলে লেটার পেয়েছে। পাঁচটি ছেলে ফেল হয়েছে—তার মধ্যে একটি ছেলে সংস্কৃতে ফেল করেছে। আমি কি করে তোমাদের কথা মানব যে, পণ্ডিতমশায় বৃদ্ধ হয়ে অক্ষম হয়েছেন! তিনি বৃদ্ধ, তিনি অবশ্যই সেকালের লোক। মনোভাব সেকেলে হওয়াই সম্ভব। কিন্তু তোমাদের কথাই মেনে নিয়ে বলছি

তাঁর সঙ্গে যদি সম্বন্ধ হয় পাঠ দেওয়া আর নেওয়ার—পড়ার আর পড়ানোর, তা হলে তাঁর মনোভাব নিয়ে বিচারের প্রয়োজন কি? তিনি একালের সমস্ত কিছুকে ব্যঙ্গ করেন? অশ্লীল রসিকতা করেন?

উত্তেজনায় তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন।

—আমি প্রত্যাশা করিনি। এ আমি—। তোমরা পণ্ডিত-মশায়ের টিকি ফোঁটা মালা নিয়ে যে সব মন্তব্য কর, তাঁকে অসভ্য বর্বর বল—সে আমি জানি। তিনি অশ্লীল রসিকতা করেন? তিনি—!

তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ক্ষোভে—ক্রোধে।

—তিনি ধর্ম শিক্ষা দিয়ে থাকেন? এও একটা অভিযোগ? ওঃ! তোমরা ধর্ম মান না? ঈশ্বর মান না? বিজ্ঞান মান? তোমরা কতটুকু পড়েছ বিজ্ঞান? তোমরা প্রত্যেকটি ছাত্র যে-যে পরিবারে জন্মেছ—মানুষ হচ্ছ—তার প্রত্যেকটি পরিবারে ধর্মাচরণ রয়েছে, ঈশ্বরে বিশ্বাস রয়েছে, পূজা রয়েছে—পার্বণ রয়েছে। তোমরা বলেছ—দাবী জানিয়েছ—সে সব উঠিয়ে দিতে? সংস্কৃত ভাষা ধর্মদর্শন ধর্মজীবন নিয়ে সমৃদ্ধ—সে-ই তার প্রাণশক্তি; সে ভাষা শিক্ষা দিতে ধর্মশিক্ষা দেন তিনি এটাও তাঁর অপরাধ?

ছেলেগুলির মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

সীতেশবাবু মাথা হেঁট করে কিছু লিখেই যাচ্ছিলেন। এদিকের আলোচনায় তাঁর যেন কোন আকর্ষণই ছিল না। এবার হঠাৎ মুখ তুলে সেই হেসেই বললেন—বিচারটা একটু একপেশে হয়ে যাচ্ছে মাস্টারমশাই। ধর্মবিচারেও একালে সেকালে অনেকটা প্রভেদ হয়নি কি? রাবণের দশটা মাথা কুড়িটা হাত—এ সেকালে যেমন বিশ্বাস করত—একালেও তাই করে কি? সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যাও কি বদলায়নি? একটা মানুষের মস্তিষ্কে দশটা মানুষের বুদ্ধি, দেহে দশটা মানুষের শক্তি—এই ব্যাখ্যা কি চলছে না আজ? বানর

বলতে—সত্যিকারের বানরকে ছেড়ে কি আমরা তাদের অনার্য জাতি বলে ব্যাখ্যা করছি না?

কথাগুলি শেষ করেই তিনি লেখা কাগজখানা পকেটে পুরে উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতেই বলেছিলেন—আমাকে মাফ করবেন। আমি বোধ হয় অনধিকার-চর্চা করেছি।

বলেই তিনি বেরিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

হেডমাস্টারমশায় আত্ম-সম্বরণ করে ছেলেদের বলেছিলেন—আমি মনে করি, মহাকাব্য পুরাণ—এ পড়তে গেলে তাতে যা আছে তাই মেনে নিয়ে পড়তে হবে। তার মধ্য থেকেই তার শিক্ষা হৃদয়ঙ্গম হবে। আগুনে ঝাঁপ দিয়ে অদগ্ধ অক্ষত দেহে কেউ ফিরে আসতে পারে কি না এ বিচার করে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা পড়া চলে না। কিন্তু সে থাক।

তিনি বলেই চলেছিলেন—জীবেনের সঙ্গে যা হয়েছিল পণ্ডিত-মশায়ের, সে আমি শুনেছি। পণ্ডিতমশাই আমাকে বলেছেন। ব্যাপারটার মূল সেখানেই। জীবেন বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে ভালো কথা। কিন্তু কাশী জগন্নাথের মন্দির ভাঙবার কল্পনাটা ভালো কথা নয়। পণ্ডিতমশায় তাতেই বোধ করি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আমিও ক্ষুব্ধ হতাম। কারণ, গতবার জীবেন পূজোর কাগজে আগমনী কবিতা লিখেছে। গত সরস্বতী পূজোতে সব থেকে বেশী খেটেছে। জীবেনদের বাড়ীতে আমি জানি শালগ্রাম শিলা আছেন। আর জীবেন—তুমি কি বলেছ যে বিজ্ঞানের সত্য-সন্ধানী আলোয় তুমি তোমার প্রপিতামহ পিতামহের সত্য চেহারা দেখতে পেয়েছ? অর্থাৎ ভণ্ড চেহারা বা ঐ রকম ধরনের চেহারা—ধর্মের নামে তাঁরা যজমানদের উপর অত্যাচার করতেন? পণ্ডিতমশায় তো এই নিয়েই তোমার পিতামহ প্রপিতামহের কথা বলেছেন?

জীবেনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এসেছিল।

চন্দ্রবাবু তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন—কাঁদছ? কেঁদো

না! যাও ক্লাসে যাও। যা সম্পূর্ণ বোঝনি—জাননি—তাই নিয়ে চর্চা করতে গিয়েছ, ঠকেছ। এখন শেখ, পড়, ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ। পড়ে যাও। কবিতা লেখ—যা জান তাই নিয়ে। আর একটা কথা বলে দি। পণ্ডিতমশায়ের মত ভালোমানুষ—শুদ্ধ মানুষ—এ আমি দেখিনি। এবং ধর্মকে ঘৃণা করবার আগে, তাকে অবিশ্বাস করবার আগে তাকে ভালো করে জানো, বোঝো। তার মূলকে সন্ধান করো। তারপর অবিশ্বাস হয় ছেড়ে দিয়ো। যাও!

সেদিন শেষ ঘণ্টায় সমস্ত ইস্কুলের ছাত্রকে সমবেত করে তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আর বলেছিলেন—ওই কথাগুলিই। ছাত্রদের কর্তব্য বুঝিয়েছিলেন।

ঠিক তার দুদিন পর থেকে তিনি লক্ষ্য করলেন, জীবেনদের দলটি স্তোত্র পাঠ শেষ হবার পর ইস্কুল কম্পাউণ্ডে ঢুকছে। শনিবারে ধর্মের ক্লাসে দেখলেন জীবেনরা নেই, চলে গেছে।

এটা তাঁর অসহ্য হয়েছিল।

ঊনপঞ্চাশ বছর ধরে স্তোত্রপাঠ বাধ্যতামূলক। ষোল বছর ধরে চলে আসছে ধর্মসভা। তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি জেনেছেন বুঝেছেন—এর মধ্যে আছে, পবিত্রতা-নম্রতা-পরিচ্ছন্নতা-শুভ্রতা। আছে শান্তি, আছে তৃপ্তি, আছে প্রসন্নতা, আছে শুচিতা। অন্ধ বিশ্বাসের কথা নেই, লোকাচারের বন্ধন নেই, পীড়ন নেই। আজও পর্যন্ত কোন দিন কোন ছাত্র এতে আপত্তি করেনি, ইচ্ছা করে দেরি করে আসেনি অনুপস্থিত হবার জন্য; ইচ্ছা করে কেউ চলে যায়নি বিনা অনুমতিতে।

পরের সোমবারে তিনি আপিসে বসেই ডাকলেন—কেষ্ট!

কেষ্ট এসে দাঁড়াতেই বললেন—এই ছেলেদের ডেকে নিয়ে এস। নাম-লেখা কাগজ হাতে তুলে দিলেন।

জীবেনরা এসে দাঁড়াল।

তিনি প্রশ্ন করলেন—আজ এক সপ্তাহ তোমরা স্তোত্রপাঠের সময় থাক না কেন? জীবেন!

—আসতে দেরি হয়ে যায় স্যার।

—সে তো ইচ্ছে করে!

চুপ করে রইল ছেলেরা।

—ধর্মসভাতেও তোমরা ছিলে না এ শনিবারে।

এবার জীবেন বললে—আমাদের ভালো লাগে না।

—হোয়াট?

—আমরা বিশ্বাস করি না ধর্মে।

—কিন্তু এ স্কুলে এ কম্পালসারি। আজ আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি। This is the second time. তৃতীয়বারে আমি ক্ষমা করব না।

আবারও সেদিন তিনি তাদের বুঝিয়েছিলেন—তিনি নিজে যা বুঝেছেন—জেনেছেন। যা বুঝে যা জেনে তিনি এই প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর এই ঊনপঞ্চাশ বছরের শিক্ষক-জীবনে এর ফল যা পেয়েছেন তাও বলেছিলেন। বলেছিলেন—আমাকে বিশ্বাস করো। আমি বলছি তোমাদের। ধর্ম নিয়ে গোঁড়ামি যত খারাপ —বিজ্ঞান নিয়ে গোঁড়ামিও তেমনি খারাপ। বিজ্ঞান তোমরা কতটুকু শিখেছ, কতটুকু জেনেছ?

ছেলেরা উত্তর দেয়নি। চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল। সেই চুপ করে থাকাটাই তাদের উত্তর। সেটা বুঝতে তাঁর দেরি হয়নি। তিনি কঠিন কণ্ঠে বলেছিলেন—তা না হলে এ ইস্কুলে তোমাদের পড়া চলবে না। এই আমার শেষ কথা যাও।

ছেলেরা চলে গিয়েছিল।

এর পর দিন-কয়েক তারা নিয়ম মতই স্তোত্র-ক্লাসে এসেছিল। তিনি খুশী হয়েছিলেন।

হঠাৎ সুকুমার ছেলেটি সেদিন এসে তাঁকে প্রশ্ন করলে—ধর্মসভা

—স্তোত্র-পাঠ উঠে যাবে স্যার? ঈশ্বর নাই? জীবেন-দা—ভূপেশ-দা'রা বলছে! ওরা উঠিয়ে দেবে!

তিনি বলেছিলেন—না।

তাকে আশ্বাস দিয়ে তিনি ইস্কুলে পাঠিয়ে নিজে আপিসে বসে কর্তব্য স্থির করে নিয়েছিলেন। তিনি অনুমান করেছিলেন কি করবে ওরা। ওরা শিক্ষা-বিভাগে দরখাস্ত করবে। স্তোত্র-পাঠ—ধর্মসভা শিক্ষা-বিভাগের পাঠ্য-সূচীর বাইরের জিনিস। সুতরাং ওসবে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে তিনি পারেন না। তিনি স্থির করলেন—সরকারী গ্র্যাণ্ট তিনি ছেড়ে দেবেন। নিজে তিনি মাইনে নেবেন না। মাইনে তিনি আজ ষোল বৎসরই এক রকম নেননি। নিজের মাইনের টাকা দান করে তিনি বিভিন্ন ফাণ্ড খুলেছেন। ব্রজকিশোরের নামে তিনি বৃত্তিস্থাপন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এ ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছাত্রকে দু' বছরের জন্য মাসিক দশ টাকা বৃত্তি দিয়ে থাকেন। দুটি গরীব ভালো-ছেলের বোর্ডিংয়ের খরচ তিনি দিয়ে থাকেন। প্রাক্তন দরিদ্র শিক্ষকদের জন্য সাহায্য ভাণ্ডার স্থাপন করেছেন—তাতে মাসিক কুড়ি টাকা তিনি চাঁদা দেন। থাকবে—এ সব এখন থাকবে। বিনা সরকারী সাহায্যেই তিনি ইস্কুল চালাবেন। মাস্টারমশায়দের বলবেন—তাঁরা নিশ্চয় তাঁর পাশে এসে দাঁড়াবেন। তিনি লড়াই করবেন। ভগবানের নাম নিয়ে তিনি ইস্কুল আরম্ভ করেছিলেন। ভগবানের নাম তিনি উঠিয়ে দিতে দেবেন না।

সীতেশবাবুকে ডেকে তিনি বললেন—আপনাকে একটা অনুরোধ করব সীতেশবাবু।

—বলুন।

—আপনার ময়দান ক্লাব আপনি বন্ধ করুন।

—বন্ধ করব?

—হ্যাঁ। আমি এ নিয়ে কোন আলোচনা করতে চাইনে, শুধু বলতে চাই এটা আপনি বন্ধ করুন।

সীতেশবাবু বললেন—ক্লাব আমি উদ্যোগী হয়ে গড়ে দিয়েছি কিন্তু ক্লাব আমার নয়, ক্লাব ছেলেদের। বন্ধ করা না-করা তাদের ইচ্ছায় নির্ভর করে মাস্টারমশাই। আপনি আমাকে বলেছেন—আমি যোগ দেব না এই পর্যন্ত বলতে পারি। আমি প্রেসিডেণ্ট আছি—ছেড়ে দেব।

সেই দিনই রাত্রে তিনি খবর পেলেন—সুকুমারকে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করেছে জীবেনরা—কয়েক জনে।

হেড পণ্ডিতমশাই খবর নিয়ে এলেন।

সন্ধ্যার পর বোর্ডিং ইনস্‌পেকশন করে চন্দ্রভূষণবাবু ঘরে বসে এই সব কথাই ভাবছিলেন। ঊনপঞ্চাশ বছর কত বিচিত্র চরিত্রের ছেলে দেখে এলেন। আজ উনিশ শো পাঁচ সালের নবগ্রাম। সমাজ রিকৃত—ধর্ম বিকৃত। ছেলেরা বারো বছর না-পার হতেই তামাক ধরত। অধিকাংশই তখন বর্ধিষ্ণু-ঘরের উঁচু জাতের ছেলে।

হৃষিকেশ দুটো সিঁথি চিরে টেরী কেটে আসত। মাঝখানের চুল গুড়িয়ে পাকিয়ে রাখত। তার মধ্যে রাখত সেই বার্ডশাই লুকিয়ে। বার্ডশাই সে পকেটে রাখত না।

চণ্ডীপুরের সরোজাক্ষের দেড় হাত লম্বা ভাল কলি হুঁকো ছিল। এক একদিন তিনি কেষ্টকে নিয়ে ছেলেদের ঘর-বাক্স খানাতল্লাশ করতেন। দশ বারোটা হুঁকো, দেড় সের দু সের তামাক, কল্কে টিকে নিয়ে আসতেন। সরোজাক্ষ ভাত খাবার পর চীৎকার করে কেঁদেছিল—মরে যাব! আমি মরে যাব!

চীৎকার শুনে উৎকন্ঠিত হয়ে তিনি ছুটে গিয়েছিলেন—কি হল?

—পেটে যন্ত্রণা। মরে যাব! আমি মরে যাব!

উৎকন্ঠিত হয়ে তিনি ডাক্তার ডেকেছিলেন। সরোজাক্ষকে দেখে ডাক্তার এসে বলেছিল—ছেলেটা ছেলেবেলা থেকে তামাক

খায় মাস্টারমশাই। তামাক খেতে পায়নি আজ, মানসিক যন্ত্রণা—সত্যিসত্যিই বোধ হয় দেহের যন্ত্রণায় দাঁড়িয়েছে। ওর তামাক চাই।

কেষ্টকে ডেকে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—কেষ্ট, যাও ওর হুঁকোটা বেছে ওকে দিয়ে এস। তামাক সেজেই নিয়ে যাও।

কেষ্ট যাচ্ছিল—সরোজাক্ষের হুঁকো নিয়ে। তিনি আবার ডেকে বলেছিলেন—হুঁকোগুলো সবই নিয়ে যাও।

পরদিন তিনি তামাক খাওয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। নিজেও তামাক ছেড়ে দিয়েছিলেন। তামাক খাওয়া জীবনে তাঁর বিলাস ছিল।

নবগ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় মেলা হয়। মেলায় সাতদিন মেতে থাকত' উরু। মেলার আগের দিনই উরু মাথায় সাবান দিয়ে চুল রুখু করে—বগলে রসুন চেপে ইস্কুলে এসে বলত—জ্বর হয়েছে স্যার। ধরতে পারতেন না প্রথম প্রথম। ভাবতেন সত্যিই জ্বর হয়েছে উরুর।

সিদ্ধি খেয়ে কুৎসিত কেলেঙ্কারী করেছিল এখানকার বর্ধিষ্ণু ধনীর ঘরের ছেলে। পড়াশুনায় কিন্তু সে ভালো। তিনি তাকে বেত মেরে জর্জরিত করে ইস্কুল থেকে বের করে দিয়েছিলেন।

নবগ্রামের বর্ধিষ্ণু ঘরের ছেলেরা ছিল উদ্ধত, সম্পদের অহংকারে যত অহংকৃত—তত ছিল তাদের পড়ায় অবহেলা। তাদের তিনি সহ্য করতে পারতেন না। এর জন্য নবগ্রামের ভদ্র-সম্প্রদায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন তাঁকে প্রায় যুদ্ধ করতে হয়েছে। তিনি কোনদিন নতি স্বীকার করেননি। কোনদিন না।

ইস্কুলের দুঃসময় গেছে। সে দুঃসময়ের হেতুর অন্যতম হেতু এই নবগ্রামের ভদ্র-সম্প্রদায়ের ছেলে। উনিশ শো ষোল সালে গৌরীকান্তকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। বিপ্লবী দলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ছেলেটির। সাময়িক ভাবে ইস্কুলের এড্ বন্ধ,

হল। তিনি পুলিশের কাছে বলেছিলেন—গৌরীকান্তকে তিনি জানেন, এমন অপরাধ সে করে নি। করতে পারে না। তবে মানুষের সেবা-ধর্ম যদি অপরাধ হয়—সে অপরাধ গৌরীকান্ত করেছে।

নবগ্রামের ওই একটি ছেলে। গৌরীকান্তকে স্মরণ করে তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। গৌরীকান্তের জন্যে পুলিশের ভয়ে অনেক ছেলে ইস্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে সময়। তার উপর ইস্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল সেবার অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। আঠারোটি ছেলের মধ্যে চারটি ছেলে মাত্র পাশ করেছিল। ইস্কুলের ছাত্র-সংখ্যা দু শো থেকে নেমে এল এক শো কুড়ি-পঁচিশে। এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে নতুন হাই ইস্কুল হল। সেদিন তিনি ভিক্ষার ঝুলি তুলে নিয়েছিলেন কাঁধে, আর হাতে নিয়েছিলেন কলম; সাধারণের কাছে ভিক্ষা করে ইস্কুল চালিয়েছিলেন—সরকারের সঙ্গে এড্ বন্ধের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। দু বছর পর সে এড্ আদায় করেছিলেন। একসঙ্গে দু বছরের টাকা। সেই টাকায় ইস্কুলের নতুন বাড়ী হয়েছিল। নতুন বাড়ীর জন্য তিনি কয়লার ব্যবসায়ী ছাত্রদের কাছে ইঁট পোড়াবার কয়লা ভিক্ষা করেছিলেন, এখানে যারা ইঁট পাড়ে পোড়ায়—তাদের বাড়ী গিয়ে বলেছিলেন—এই ইস্কুলে তোমাদের ছেলেদের পড়ার সুবিধে করে দেব, হাফ ফ্রি করে দেব তোমাদের, কম মজুরীতে ইঁট পুড়িয়ে দিতে হবে। দিয়েছিল তারা। এ স্কুলের—। চন্দ্রভূষণবাবু ঘরখানার চারিদিক চেয়ে দেখলেন। প্রতিটি ইঁট তিনি দেখে দিয়েছেন—নরম ইঁট আধপোড়া ইঁট তিনি বেছে বেছে ফেলে দিতেন।

ওই স্কুলের আয়রণ চেস্ট!

ওটা হয়েছে উনিশ শো আঠারো সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী ছাত্রদের জরিমানার টাকায়। ছেলেরা টেস্টের কোশ্চেন চুরি করেছিল। প্রতিটি ছেলের দশ টাকা হিসেবে জরিমানা করেছিলেন।

পরীক্ষার খাতা দেখেই তিনি বুঝেছিলেন—কোশ্চেন জেনে ছেলেরা উত্তর লিখেছে।

তিনি ছেলেদের ডেকে বলেছিলেন—আমি শুধু বলছি—তোমরা আমার পা ছুঁয়ে বল। সত্য কথা বল।

স্বীকার করেছিল ছেলেরা।

তিনি বলেছিলেন—আমি খুশী হয়েছি। কিন্তু অপরাধের শাস্তি নিতে হবে তোমাদের। ভবিষ্যতে ছেলেরা আর চুরি করতে না পারে এর ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে। সাজা দিতেই হবে। দশ টাকা ফাইন দিতে হবে প্রত্যেককে।

তুটি গরীব ভালো ছেলের ফাইনের টাকা তিনি নিজে দিয়েছিলেন। নবগ্রামের বাবুদের ছেলে ছিল একটি—তাকে তিনি এ্যালাও করেননি। আর করেননি বোর্ডিংয়ের একটি ধনীর ছেলেকে। এরাই ছিল পাণ্ডা, এবং পড়ায় কাঁচা। তা নিয়েও অনেক ক্ষোভ হয়েছিল। তাতে তিনি হার মানেননি। কোন আপোষ করেননি।

ব্রজকিশোরের সঙ্গে তিনি আপোষ করেননি। একমাত্র ছেলে ব্রজকিশোর।

তিনি আপোষ করবেন না। কখনও না। কিছুতে না।

চন্দ্রভূষণবাবু ডাকলেন—কেষ্ট!

—আজ্ঞে!

—আলো নিয়ে সঙ্গে এস। দেখ, হেড পণ্ডিতমশায় কোথায়। ডাক তাঁকে, সুকুমারকে দেখতে যাব আমি।

—এই রাত্রে?

—হ্যাঁ, রাত্রেই যাব।

হাসলেন তিনি। রাত্রি আর দিন! কেষ্ট বুড়ো হয়েছে, ভুলে গেছে। রাত্রি বারোটায় সংবাদ পেয়েছেন, গ্রামান্তরে একটি ভালো ছেলের কঠিন অসুখ! তিনি দেখতে গেছেন। কেষ্টই সঙ্গে

গিয়েছে। ডাক্তার নিয়ে গেছেন। বোর্ডিংয়ের ছেলের টাইফয়েড, রাত্রে দুবার গিয়ে খবর নিয়েছেন। কতদিন এমনি উঠে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বোর্ডিংয়ের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে এসেছেন। ঘরে আলোর ছটা পেয়ে ডেকেছেন—এতরাত্রে আলো জ্বেলে কি করছ? পড়ছ? না। অসুখ করবে, শুয়ে পড়। নিজের হাতে আলো নিভিয়ে দিয়ে এসেছেন। ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল—তিনটে মাস—নিয়মিত নিত্য তিনি বোর্ডিংয়ের ঘরে ঘরে কান পেতে শুনে আসেন, আজও আসেন। তখন সদ্য ঘর ছেড়ে আসে নতুন ছেলেরা। ভর্তি হয়। প্রথম প্রথম নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে! মা ছেড়ে আসে! রাত্রে ঘুম আসে না। সকলে ঘুমিয়ে গেলে তারা কাঁদে। অস্ফুট কণ্ঠে মধ্যে মধ্যে মাকে ডাকে আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। তিনি ডেকে তুলে সান্ত্বনা দিয়ে আসেন। এককালে নবগ্রামের পথে বের হোতেন তিনি। ছেলেদের আড্ডা-খানাগুলি জানা ছিল তাঁর। তাস চলত, পাশা চলত। গল্প হৈ-চৈ করত গ্রামের ছেলেরা। তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলতেন—

—অনেক রাত্রি হয়েছে কিশোরী। ঘুমিয়ে পড়। No more boys, no more.

বলেই চলে আসতেন। কোথাও শুধু গলা ঝেড়ে সাড়াটুকু দিয়েই চলে আসতেন।

সুকুকে নিষ্ঠুরভাবে মেরেছে।

খেজুরের ডাল দিয়ে পিঠখানা প্রায় রক্তাক্ত করে দিয়েছে। লম্বা রক্তমুখী দাগে পিঠখানা ক্ষতবিক্ষত।

স্তব্ধ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। সুকু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

চন্দ্রভূষণবাবুর চোখে আগুন জ্বলে উঠল। বার্ধক্যের পীত পাণ্ডুর দীপ্তিহীন চোখ দুটি অস্বাভাবিক দীপ্তিতে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। হেড পণ্ডিতমশায় ভয় পেলেন। চন্দ্রভূষণবাবুর এ দৃষ্টি অন্যে চেনে না, তিনি চেনেন।

ব্রজকিশোরকে চন্দ্রভূষণবাবু যেদিন বলেছিলেন—বেরিয়ে যা তুই, ঘর থেকে বেরিয়ে যা—সেদিন তিনি তাঁর চোখে এই দৃষ্টি দেখেছিলেন।

নবগ্রামের বাবুদের একটি ভালো ছেলেকে সিদ্ধি খেয়ে কুৎসিত ব্যবহারের জন্য হলে দাঁড করিয়ে বেতের ঘায়ে জর্জরিত করে দিয়েছিলেন যেদিন—সেদিন এই দৃষ্টি তাঁর চোখে তিনি দেখেছিলেন।

হেডপণ্ডিত সভয়ে ডাকলেন—মাস্টারমশাই!

চন্দ্রভূষণবাবু কথার উত্তর দিলেন না। দীর্ঘ পদক্ষেপে নীরবে স্কুলে ফিরে এলেন তিনি।

পরের দিন স্তোত্রপাঠের পরই তিনি বললেন—তোমরা হলে এসে দাঁড়াও! কেষ্ট! আমার বেত নিয়ে এস।

—জীবেন চ্যাটার্জী, ভূপেশ গাঙ্গুলি, দীপেন মিত্র, নিতু দত্ত! দাঁডাও এদিকে এসে। কেষ্ট—টুল দাও চারখানা। দাঁড়াও তোমরা টুলের উপর।

পণ্ডিত শিউরে উঠলেন—চন্দ্রবাবুর চোখে সেই দৃষ্টি!—মাস্টার-মশাই! মাস্টারমশাই!

গ্রাহ্য করলেন না চন্দ্রবাবু।

এ অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য তিনি সহ্য করবেন না। আপোষ তিনি করবেন না।

সেকেণ্ড মাস্টার এগিয়ে এলেন।—মাস্টারমশাই!

—Please, please—আমার কর্তব্যে আপনি বাধা দেবেন না সীতেশবাবু।

বেত মেরেই ক্ষান্ত হননি তিনি। তাদের স্কুল থেকে বের করে দিয়েছেন। এ স্কুলে তাদের স্থান তিনি দেবেন না। কখনও না, কিছুতে না। আদর্শের বিপক্ষে কখনও তিনি আপোষ করেননি। একটা সংঘর্ষ তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন—জীবেন ভূপেশ ছেলেদের

পাণ্ডা, নবগ্রামের ছেলে, ছেলেদের তারা মাতাতে পারে, প্রয়োজন হলে ভয় দেখাতে পারে, মেরে সাজা দিতে পারে। জীবেন কবিতা লেখে বলে ছেলেদের প্রিয়ও বটে। তার উপর সীতেশবাবু আছেন পিছনে। কিন্তু এমন প্রচণ্ড হতে পারে এ সংঘর্ষ, এ তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। হোক—সে সংঘর্ষ হোক কল্পনাতীত, তবু তিনি আপোষ করবেন না।

উঠে পড়লেন তিনি চেয়ার থেকে।

সেকেণ্ড পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়ল। তার ক্লাস নাইনে ইংরিজীর ক্লাস। চেম্বার্স ডিকসনারী, নোটের খাতা, ইংরিজী সিলেকসন নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

প্রকাণ্ড হল ঘরটা খাঁ খাঁ করছে। হলের মাঝখান দিয়েই পথ।

সেই ঘড়ির পেণ্ডুলামের টক্‌টক্ শব্দটা ক্রমান্বয়ে ধ্বনিত হয়ে চলেছে। ব্রজকিশোরের মৃত্যু-রাত্রির স্মৃতি জড়ানো রয়েছে ওই শব্দটার মধ্যে। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস আপনি বুক চিরে বেরিয়ে এল। ব্রজকিশোর! ব্রজকিশোর নেই —ইস্কুল—নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ—এও থাকবে না? কি নিয়ে থাকবেন তিনি? পরমুহূর্তেই তিনি সচকিত হয়ে উঠলেন—নিজেকে শক্ত করে তুললেন। না—যাক। আদর্শের জন্য তিনি ব্রজকিশোরকে ত্যাগ করেছিলেন—আদর্শ ক্ষুণ্ণ করে নবগ্রাম বিদ্যাপীঠকেও বাঁচিয়ে রাখতে চান না। দীর্ঘপদক্ষেপে তিনি হাঁটতে সুরু করলেন। ব্রজকিশোর এম-এ পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। নবগ্রামের বাবুদের ছেলেদের সঙ্গে তার গোপন গাঢ় অন্তরঙ্গতা ছিল। এই ইস্কুলে পড়বার সময় থেকেই বন্ধুত্ব। তিনি এটা পছন্দ করতেন না। ব্রজকিশোরের অনুরাগের কারণ বুঝতে তাঁর ভুল হয়নি। নবগ্রামের সম্পন্ন ঘরের সন্তানগুলির প্রধান আকর্ষণ তাদের পোষাক, তাদের চালচলন। তিনি বলতেন—খোলস। ইশপের সিংহ-চর্মাবৃত গর্দভের গল্প পড়েছ? অবশ্য গর্দভ সকলে নয়, খাঁটি সিংহও দু'

একজন আছে। এবং চামড়া গায়ে গর্দভের স্থলে নেকড়ে চিতাবাঘও আছে, তবুও ওদের সঙ্গে সঙ্গ করো না। ওদের পথ আমাদের পথ এক নয়। ওরা চায় সম্পদ আর প্রতিষ্ঠা। আর কিছু না। আমি চাই সত্যকারের বিদ্যা। তোমাকে তাই চাইতে হবে। নবগ্রামের বাবুরা জাতে ব্রাহ্মণ কিন্তু কাজে ওরা ক্ষত্রিয় আর বৈশ্যের পেশা নিয়েছে। ওরা ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণ নয়। ব্রাহ্মণ আমরা। কায়স্থ হয়েও তপস্যা করে ব্রাহ্মণ হয়েছি। তোমাকে সেই ব্রাহ্মণ হতে হবে।

স্কুল-জীবনে ব্রজকিশোরকে তিনি রক্ষা করেছিলেন। ব্রজকিশোর অবশ্য গোপন বন্ধুত্ব গোপন রাখতেই পেরেছিল, অতি সুকৌশলে— গোপন রেখেছিল। একদিনের জন্যও ব্রজকিশোর ওদের গায়ের গন্ধ গায়ে নিয়ে আসেনি, কোন দিন ওদের বর্ণাঢ্য জামা-কাপড়ের ছাপ ওর গায়ে দেখতে পাননি। কখনও বিড়ি-সিগারেটের গন্ধ পাননি, ব্রজকিশোরের জামার রঙের সঙ্গে ওদের পোশাকের সাদৃশ্য দেখেননি। সেই ব্রজকিশোর কলকাতায় কলেজে পড়তে গেল। ডিস্টিংশনের সঙ্গে বি-এ পাশ করলে। এম-এ ক্লাসে ভর্তি হল। হঠাৎ একদিন গুজব শুনলেন—ব্রজকিশোর পড়া ছেড়ে দিয়েছে। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু নবগ্রামের সুরেনের সঙ্গে কয়লার ব্যবসা করতে নেমেছে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এও সম্ভব? ব্রজকিশোর— তাঁর এত কল্পনার ব্রজকিশোর—? তিনি ছুটে গিয়েছিলেন কলকাতায়! নিজের চোখে যাচাই করে—দেখে আসবেন।

কলকাতায় পৌঁছে ইউনিভারসিটি ঘুরে ব্রজকিশোরের বাকী মাইনে এবং অনুপস্থিতির দিনের হিসেব নিয়ে তার মেসে এসে উঠেছিলেন। বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে। তখনও ফেরেনি ব্রজকিশোর। ব্রজকিশোরের দরজায় একটা কাঠের বোর্ড টাঙানো ছিল—কোল-মার্চেন্ট ব্রোকার কলিয়ারি-এজেন্ট। তিনি আর

দাঁড়াননি, একখানা কাগজে তাঁর নাম লিখে চাকরের হাতে দিয়েই চলে এসেছিলেন।

তারপর ব্রজকিশোরের সঙ্গে সুদীর্ঘ পত্রালাপ। পত্রে ব্রজকিশোর লিখেছিল—আপনি আমাকে শেষ পর্যন্ত স্কুল-মাষ্টারী করিতে বাধ্য করিবেন বলিয়াই আমি এম-এ পড়া ছাড়িয়াছি। ইস্কুলমাষ্টারী আপনার যত ভালোই লাগুক আমার ভালো লাগে না। আপনি জীবনে যাহাকে বিলাস বলেন আমি তাহাকে অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি। আপনি দুঃখের মধ্যে আনন্দ অনুভব করেন—ত্যাগ ও কৃচ্ছ্র সাধনের গৌরব অনুভব করেন—সে অনুভূতি আমার নাই—আমি দুঃখকে দুঃখই বলি—কষ্ট পাই ; ত্যাগের অপেক্ষা অর্জনের গৌরবকে আমি ছোট মনে করি না। আমাকে আপনি ক্ষমা করিবেন। অনুগ্রহপূর্বক আমার স্বাধীনতা স্বীকার করিবেন, আমার সে বয়স হইয়াছে। আমি আমার পথ বাছিয়া লইয়াছি।

তিনি আপিসে বসেই তার উত্তর লিখেছিলেন—যে পথ তুমি বাছিয়া লইয়াছ সে পথ ও আমার পথ বিপরীতমুখী। সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে আর দেখা হইবে না—এটা তুমি ভাবিয়া বুঝিয়া দেখিয়াই পত্র লিখিয়াছ বলিয়া মনে করি। অতঃপর যে পত্র তুমি আমার পাইবে—জানিবে সে পত্র আমার শেষ শয্যায় শুইয়া লেখা পত্র।

পণ্ডিত কিশোরীমোহন সচকিত হয়ে তাঁকে ডেকেছিলেন—মাস্টারমশাই !

পত্র লেখার মধ্যে চন্দ্রভূষণবাবু এমন মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে—পণ্ডিত কখন এসেছিলেন—জানতেই পারেন নাই।

চোখ তুলে চন্দ্রভূষণবাবু বলেছিলেন—পণ্ডিতমশাই !

—কি হয়েছে মাস্টারমশাই !

—কিছু হয়নি তো !

—হয়েছে। আপনার মুখ দেখে বুঝতে পারছি। এমন মূর্তি এমন দৃষ্টিতো কখনও আপনার দেখিনি! কি হয়েছে—বলুন?

চন্দ্রবাবু চিঠি দুখানা তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। চিঠি দুখানা পড়ে পণ্ডিত বলেছিলেন—কিন্তু এ কি পত্র আপনি লিখলেন? না—না—।

—ঠিক লিখেছি। দিন।

—না—না—না মাস্টারমশাই!

—ওর মুখ আমি দেখব না পণ্ডিতমশায়। সেই মৃত্যুকালে যদি ও আসে—তো—। একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—আমি খবর পেয়েছি, ব্রজকিশোর মদ্য পান করতে আরম্ভ করেছে। সুরেনদের ফার্ম থেকে হোটেলে সায়েবদের পার্টি দিয়েছিল, সেই পার্টিতে—। নিজের চোখে দেখেছেন এমন মানুষ আমাকে বলেছেন।

পত্রখানা উল্টোদিক থেকে সত্য হয়ে গেল। তাঁর মৃত্যু-শয্যায় দেখতে আসার বদলে ব্রজকিশোর নিজে মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে তাঁকে দেখা দিতে এল। টাইফয়েডে আক্রান্ত ব্রজকিশোরকে সুরেন এসে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। ব্রজকিশোর কেঁদেছিল, মাফ চেয়েছিল তাঁর কাছে। বলেছিল—আমি ভাল হয়ে উঠে আবার কলেজে ভর্তি হব।

ব্রজকিশোরের মৃত্যু হয়েছিল ভোর রাত্রে। সেবা যারা করছিল তারা তখন ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে ঢুলছে। তিনি শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। অকস্মাৎ জীবন-দীপ নিভে গেল। অত্যন্ত নিঃশব্দতার সঙ্গে—অগোচরে তিনি তাকিয়ে থেকেও ঠিক বুঝতে পারেননি; ঠিক দিন শেষে রাত্রি নামার মত। আলো ম্লান হয়ে আসে ক্ষণে ক্ষণে—তারপর হঠাৎ যে কখন অন্ধকার ঘনিয়ে রাত্রি নামে ঠিক বোঝা যায় না। ঠিক তেমনি। তিনি বুঝতে পেরে চাদরখানি টেনে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছিলেন।

পণ্ডিতমশায় ছিলেন তার পাশে। তিনিই প্রথম জেগেছিলেন। আর্তস্বরে তিনি ডেকে উঠেছিলেন—মাস্টার মশাই! কি হল? কিশোর? কিশোর?

মৃদুস্বরে চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—নেই। চলুন ইস্কুলের সিঁড়িতে গিয়ে বসি।

ইস্কুলের সিঁড়িতে বসে দুইজনেই নির্বাক হয়ে বসেছিলেন। নিস্তব্ধ শেষ রাত্রি, বায়ুস্তরে অন্ধকারে—পৃথিবীর সর্বাঙ্গে অণু-পরমাণুতে অনেক স্তব্ধতা ক্লান্তি! তারই মধ্যে তাঁরা যেন ডুবে যাচ্ছিলেন, হারিয়ে যাচ্ছিলেন। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে তিনিই প্রথম বলেছিলেন—সিঁড়িগুলি বড় কম চওড়া। পুরনোও হয়েছে, ফেটেছে। এবার ভেঙে সিঁড়িগুলি বেশ চওড়া করে করাতে হবে।

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে আবার বলেছিলেন—গোড়াতে প্ল্যান তো ভালো হয়নি, অনেক খুঁত থেকে গিয়েছে। এ সবগুলি ভেঙে-চুরে এবার ঠিক করতে হবে।

পণ্ডিতমশাই বলেছিলেন—ইস্কুলের কথা এখন থাক মাস্টারমশাই।

চন্দ্রবাবু বলেছিলেন—ব্রজকিশোর গেল—এখন এই ইস্কুলই সম্বল রইল পণ্ডিতমশায়। বুড়ো বয়সে খেতেও দেবে। দেবে না? অক্ষম হলেও আমাকে একটা পেনসন দেবে না? তা দেবে। ইস্কুলেই দেহ রাখব, ছেলেরাই সৎকার করবে, ওরাই শ্রাদ্ধ করবে। ওর কথা ছাড়া আর কোন্ কথা কইব?

একটু হেসেছিলেন।

আজ সেই ইস্কুল—! সেও কি?

নিস্তব্ধ হলে ঘড়িটা টক্ টক্ শব্দ করে চলছে। মনে করিয়ে দিচ্ছে—ব্রজকিশোরের মৃত্যু-রাত্তির কথা। ঠিক তেমনি।

সামনে ক'মাস পরেই গোল্ডেন জুবিলী!

হঠাৎ তিনি ঘুরলেন। বারান্দায় এসে খড়খড়িতে ঝোলানো পেটা ঘণ্টাটার ফাঁস থেকে কাঠের হাতুড়িটা খুলে নিয়ে ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন।

মাস্টারেরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন—কে, ঘণ্টা বাজাচ্ছে! ওই ছেলেরা নিশ্চয়! ওদের দুষ্ট বুদ্ধির কি সীমা-পরিসীমা আছে। পণ্ডিত বলতে বলতেই এলেন—পাষণ্ডের দল সব! হতভাগারা! কুষ্মাণ্ড কোথাকার!

অবাক হয়ে গেলেন তাঁরা। হেডমাস্টার ঘণ্টা বাজাচ্ছেন!

—ছুটি। কেষ্ট দরজা বন্ধ কর।

আপিসে এসে তিনি কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে বসলেন।

পণ্ডিত বললেন—ইস্কুলের লম্বা ছুটি দিয়ে দেবেন বোধ হয়। নয় তো বন্ধ!

না।

চন্দ্রবাবু রেজিগনেশন লেটার লিখছিলেন। চিঠি হাতে উঠে দাঁড়ালেন। সেই পোষাকেই দীর্ঘ-পদক্ষেপে বেরিয়ে পড়লেন পথে। সেক্রেটারীর বাড়ী।

ছেলেরা ফিরে আসুক—ইস্কুল বাঁচুক। আমার আদর্শ ওরা মানছে না, আমার কাল গত হয়েছে। আমি চলে যাচ্ছি—ইস্কুল বাঁচুক।

সেক্রেটারী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। এ কি হয়?

—হয়। তাই নিয়ম। এই হবে।

—সামনে জুবিলী?

—হবে। করবে ওরা।

—অন্ততঃ ততদিন থাকুন!

—না।

মাস্টারেরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সেকেণ্ড মাস্টার বললেন—উনি তো রইলেনই। কাছেই ওই বাড়ী।

হাসলেন চন্দ্রবাবু। বিচিত্র হাসি।

জুবিলী হয়ে গেল সেদিন। কিন্তু চন্দ্রবাবু আসেননি। তিনি কাশীতে চলে গেছেন। তাঁর পত্র একখানি এসেছিল। তাতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি লাইন লেখা, একটু বদল করে দিয়েছিলেন—

যখন আমার চরণ চিহ্ন পড়ে না আর এই ঘাটে—
তখন নাই বা মনে রাখলে।

# বাবুরামের বাবুয়া

বাবুরাম জমাদার।

বাবুরাম জমাদারকে যদি কেউ চোখে দেখতে চাও তবে হাওড়াতে ট্রেনে চড়ে চলে যাও, বেশী দূর না, শান্তিনিকেতন পার হয়েই যে জংসনটা পাবে, সেই জংসনে নেমে ব্রাঞ্চ লাইনে চাপতে হবে—ব্রাঞ্চ লাইনে বারো-তেরো মাইল। ছোট গাড়ি। বারো মাইলেই চারটে স্টেশন পার হতে হয়। পঞ্চম স্টেশনে নেমো। তবে যদি জংসন স্টেশনটাতেই কি অন্য যে কোন স্টেশনে কলিকালের ভীম বা মহাদেব কি এমনি ধরনের চেহারার কোন মানুষকে দেখতে পাও, এই বুকের ছাতি—মাথায় বাবরী চুল—টিকলো নাক, ইয়া টাঙির মত গোঁফ—বড় বড় চোখ, তেমনি দু'খানা শক্ত সবল হাত, তবে তার কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করো। বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। হয় তো বা মানুষটার চেহারা চোখে পড়বার আগেই তার গলার আওয়াজই তোমাকে চমকে দেবে। অথবা তার হা-হা হা-হা হাসি।

আমি তার গলার আওয়াজ শুনেই চমকে উঠে চারিদিক চেয়ে দেখতে চেয়েছিলাম—এমন গলার আওয়াজ যার, সে মানুষটা কে? কেমন? চোখ ফিরিয়ে খুঁজতে হল না—প্লাটফর্মের অনেক লোকের আওয়াজ ছাপিয়ে যেমন তার গলাটাই কানে এসে পৌচেছিল বিশেষভাবে, ঠিক তেমনি ভাবেই অনেক লোকের ভিতরেও তার চেহারাটাই আগে চোখে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল, আজকালকার ক্যানেডিয়ান ইঞ্জিন প্রথম দেখবার কথা।

দেখেছিলাম আসানসোলে প্রথম। ওভারব্রিজের উপর দাঁড়িয়েছিলাম, ট্রেনের দেরি ছিল, নিচে নামিনি প্লাটফর্মে যাত্রীর ভিড় আর ফেরিওয়ালাদের ঠেলাগাড়ির ধাক্কার ভয়ে। হঠাৎ কোত্থেকে সাত সুরে মেশানো ভরাট ভো-ওঁ-ওঁ আওয়াজ। জাহাজের ভো-এর সঙ্গে মিল আছে—তবু অন্য রকম। যেমন জোরালো ভরাট, তেমনি সুরেলা। বাঁয়া তবলার আসরে হঠাৎ যেন পাখোয়াজে কোন জবরদস্ত ওস্তাদ আওয়াজ তুলে দিলে। ইয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে হল না—চোখে পড়ল মাথা থ্যাবড়া বিরাট লম্বা ইঞ্জিনখানা। মনে হল কলেজী কুস্তীর আসরে গামা কি গোলাম কি কিঙ্কর সিং এসে দাঁড়িয়েছে। বাবুরাম কুস্তী করে পালোয়ান হবার চেষ্টা করলে গামা গোলাম না হোক—কাছাকাছি কিছু হত। তাই বলছি, বাবুরামকে খুঁজে বের করতে হয় না—বাবুরাম আপনি চোখে পড়ে। অন্ততঃ আমার চোখে আপনিই পড়েছিল এবং আমার বিশ্বাস সকলেরই চোখে পড়বে। যাকে বলে শালপ্রাংশু মহাভুজ এবং বিশাল বক্ষ। কাঁধে একখানা পাট করা রঙীন গামছা। কোলে একটি বছর খানেকের দামাল ছেলে। তার গায়ে দামী রঙীন সিল্কের ফ্রক—পায়ে বাটার সাদা হাফ মোজা—লাল টুকটুকে জুতো। মুখে পাউডার, চোখে কাজল, কপালে টিপ। ছেলেটিকে দু'হাতে উপরে আকাশের দিকে তুলে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে হা-হা-হা-হা শব্দে অট্টহাসি হাসছে।

ছেলেটা দু'হাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না।

—লে-লে পেড়ে লে। লে পেড়ে। ডাক-ডাক।

ছেলেটা ছোট্ট হাত দু'টির ইশারা দিয়ে আধ-আধ ভাসায় বলে উঠল—আ-আ-আ।

এবার বুঝলাম। বেলা তখন অপরাহ্ণ। তিথিতে শুক্লপক্ষ। পূর্ণিমার কাছাকাছি। পূর্বদিকে আকাশে চাঁদ তখন দেখা দিয়েছে।

ছেলেটা সেই চাঁদকে ডাকছে। বাবুরাম তার সাধ্যমত উঁচুতে মাথার উপর তুলে তাকে চাঁদ ধরতে বলছে।—লে পেড়ে। লে।

স্টেশনটা আমাদের গ্রামের স্টেশন। ট্রেন আসছে, প্লাটফর্মে যাত্রীরা এখানে-ওখানে ছড়িয়ে বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে। মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিশালদেহ বাবুরাম ওই ছেলেটিকে নিয়ে নিবিড় আনন্দে মগ্ন হয়ে রয়েছে, কারুর বা কোন দিকে দৃকপাত নেই তার। ছোট স্টেশন, ছোট লাইন—যাত্রীর সংখ্যাও কম, তিরিশ-চল্লিশ জনের মত। কিন্তু তিরিশ-চল্লিশ জনের মধ্যেই সে স্বতন্ত্র—সে বিশিষ্ট—সে অদ্ভুত। আমি অবাক হয়েই তার দিকে তাকিয়েছিলাম। ভাবছিলাম—এ কে ?

লোকটি বিদেশী তাতে সন্দেহ রইল না। আমার দেশের লোকদের আমি চিনি। তাদের কথা বুঝি, তাদের কথার সুর আমার জানা। লোকটির উচ্চারণে কথার সুরে বিদেশী টান। মনে হল কারুর বাড়ির চাকর হবে। তাদের ছেলেকে কোলে নিয়ে বেড়াতে এসেছে। ছেলেটির পোশাকে, প্রসাধনের পারিপাট্যে, সিল্ক পাউডার মোজা জুতো দেখেই মনে হল কথাটা।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। ছেলেটি আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। লোকটা ছেলেটাকে হঠাৎ সজোরে ছুঁড়ে দিলে শূন্যে—লেঃ—যা পেড়ে লিয়ে আ—য়। তারপরই হাতে তালি দিয়ে অট্টহাসি হেসে উঠল হা-হা হা-হা, এবং মুহূর্তে দুই হাত প্রসারিত করে পতনশীল ছেলেটিকে লুফে নিলে। ছেলেটি ডুকরে কেঁদে উঠল।

ছেলেটির পিঠে গোটা দুই আদরের চড় মেরে চুমু খেয়ে বুকে চেপে ধ'রে বললে—দূর—দূর—দূর—ডর-পোক্‌না! দূর ভীতু কোথাকার! দূর—দূর—দূর !

ঠিই এই মুহূর্তেই স্টেশনের বাইরে থেকে প্রায় ছুটে এসে ঢুকল একটি মেয়ে। পরনে একখানা লাল সিল্কের শাড়ী; পাতলা লম্বা ধরনের কালো একটি মেয়ে; কপালে হাল-ফ্যাসানের বড় একটা

প্ল্যাষ্টিকের টিপ—মুখে একমুখ পান—একদিকের গালে পোরা রয়েছে, হাতে হাতভর্তি কাচের চুড়ি; চুল বাঁধার ঢং দেখে মেয়েটিকে সৌখীন বলে মনে হয়, কাঁধে একখানা ধবধবে দামী টার্কিশ তোয়ালে, হাতে একটা কাচের ফিডিং বট্ল্। সে এসেই ওই বিশালদেহ লোকটির সামনে থমকে দাঁড়াল। আমি তার পিছন দিকটা দেখতে পাচ্ছিলাম; চোখের দৃষ্টি দেখিনি; কিন্তু বিশালদেহ মানুষটিকে এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যেতে এবং তার মুখ শুকিয়ে যেতে দেখে সন্দেহ রইল না যে, মেয়েটির চোখে কঠোর দৃষ্টি ফুটে উঠেছে, এবং সে এমনই কঠোরতা যে এত বড় মানুষটা তার সামনে এক মুহূর্তে এতটুকু হয়ে গেছে!

মেয়েটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল—ফের! ফের কাঁদাচ্ছিস! দেখবি!

লোকটি হাসবার চেষ্টা করলে—হে-হে-হে-হে!

হা-হা হা-হা নয়।

প্রাণহীন হাসি—অপ্রতিভ হয়েছে—ভয় পেয়েছে লোকটা।

মেয়েটি এবার চিলের মত ছোঁ দিয়ে ছেলেটিকে ছিনিয়ে নিলে।—দে, দে, আমার ছেলে দে! দে!

সযত্নে ওই ধবধবে তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে ছেলেটিকে বুকে তুলে নিলে সে এবং চলে গেল বেরিয়ে। লোকটি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে।

স্টেশনের জমাদার ঢন-ন নো-ন-নো শব্দে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল এই মুহূর্তে। ট্রেন আসছে।

মেয়েটি চলে গিয়েছিল—সে সিগারেট টানতে টানতে আবার ফিরে এল।

আধ-খাওয়া সিগারেটটা লোকটির হাতে দিয়ে বললে—লে খা।

সিগারেটটি নিয়ে তাতে একটা টান দিয়ে তোষামোদ ক'রে হেসে লোকটি বললে—দে, ওকে দে! পায়ে পড়ি তোর। আর এমন করব না। তুর কিরা!

—তু কোন্ দিন মেরে ফেলাবি ওকে! এমন ক'রে ছুঁড়ে দেয়? যদি পড়ে যায় আছাড় খেয়ে। হাত যদি ফস্কে যায়?

এবার—হা-হা হা-হা শব্দে অট্টহাসি হেসে উঠল লোকটা।

—তাই যায়! আমার হাত ফস্কে?—হা-হা হা-হা!

ট্রেন এল। তারা ট্রেনে চেপে চলে গেল।

* * *

সেদিন নাম জানা হয়নি।

পরদিন জানলাম—ওর নাম বাবুরাম।

পরদিন ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। বাড়ি ফিরে বাইরের বাড়িতে দেখলাম ওই মেয়েটি বসে রয়েছে বাগানে একটা গাছতলায়। কোলে ওই ছেলেটি। আজ গায়ে আর একটা জামা। বুঝতে পারলাম রঙ দেখে। কাল জামাটা ছিল রঙীন, আজ জামাটা সাদা; ধোয়া ইস্ত্রী করা জামা, ধবধব করছে, চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। ছেলেটিকে নিজের দুই হাতের দুই আঙুল ধরিয়ে হাঁটাচ্ছে—হাঁটি হাঁটি পা—পা!

আমি বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে কৌতূহলের শেষ ছিল না। কিন্তু কি ভাবে পরিচয় জিজ্ঞাসা করব ঠাওর করতে পারছিলাম না। কারা এরা? এখানে কোথায় এসেছে?

এই মুহূর্তেই সেই ভারী গলার আওয়াজ পেলাম।

—জলদি জলদি তুর কাম তু সেরে লে! আমার কাম হয়ে গেল!

এ গলার আওয়াজ ভুল হবার নয়। ওই মেয়েটি এখানে না থাকলেও আমার ভুল হত না। হয় তো একটু বিলম্ব হত। মেয়েটিকে এখানে দেখে তাও হল না।

কথা বলতে বলতেই সে আমাদের বাড়ির পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এল। মাথায় বিষ্ঠার পাত্র নিয়ে সে এসে দাঁড়াল। লোকটি মেথর!

বুকে হাত দিয়েই সে বললে—আমার নাম বাবুরাম জমাদার। ছোট লাইনের জমাদার মেথর আমি বাবু; তোমরা তো শুধু বাবু গো, আমি বাবু—রা—ম। কি বলগো সুখীয়া! বলেই সে অট্টহাসি হেসে উঠল।

সুখীয়া অর্থাৎ সে মেয়েটি বলে উঠল—মর মুখপোড়া—বাবু—রা—ম! বাবুরাম মেথর! না—বাবু—রা—ম! কার কাছে কি বলে তার ঠিক নাই।

সে কথা গ্রাহ্যই করল না বাবুরাম। বললে—উঠো আমার জমাদারনী—সুখীয়া। পরম সুখীয়া বাবু! আমার জিন্দগীর ওহি তো একঠো সুখ আছে! হাঁ। তবে আমাকে বড় বকে বাবু; মারে ভি!

—মারবে না? বকবে না? আমি তুকে না মারলে—না বকলে তু কোন্ রোজ দারু পিয়ে খুন হয়ে থাকতিস। পড়তিস কোথা থেকে—গর্দানা ভাঙতিস। নয় তো কলিজা ফেটে হয়ে যেতিস খতম্।

—হা-হা শব্দে হেসে উঠল বাবুরাম।

—হাঁ-হাঁ, তা যেতাম। উ ঠিক বাত। তা আজ তো খুব করে মদ খাব। বাবুর কাছে বকশিশ লিব। হাঁ। আজ তু কিচ্ছু বলবি না। হাঁ। কত বড় বাবু। কত নাম।

বাবুরাম আমার নাম জানে, খ্যাতির কথা জানে। এই ছোট লাইনে কাজ করে এবং লাইনের স্টেশনের গ্রামগুলিতেও ভদ্রলোকের বাড়িতে কাজ করে। সেই সূত্রেই আমাদের বাড়ির কাজ নিয়েছে এবং আমার কথা জেনেছে।

বাবুরাম অভিযোগ করে বললে—নামই শুনি তোমার বাবু, চোখে দেখি না। তুমি শহরে থাক। দেশে এস না। কাল তোমার ভাইবাবু বললে—বাবুরাম, দাদা আসছে—সব সাফা ক'রে দে। তা দিলাম সাফা ক'রে। দাও বকশিশ। তিনটে টাকা তো

দাও। দু' টাকার একটা বোতল। আর এক টাকাতে ভাল গন্ধ কিনব বাবু! আতর। আতর।

বলে সে কোঁচড় থেকে একটা শিশি বের করে একটু আতর তার গোঁফে বুলিয়ে নিলে।

আমার ভারী বিচিত্র মনে হচ্ছিল লোকটিকে। এমন সরল সবল মানুষ সহজে চোখে পড়ে না। ওর আতর মাখা দেখে আমি আদৌ বিস্মিত হইনি! যাদের ছেলের পোশাক-প্রসাধন এমন সুন্দর, তারা আতর মাখবে, তাতে বিস্ময়ের কি আছে! কাল প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল ছেলেটি এদের নয়। মনে হয়েছিল—কোন বাড়ির ঝি-চাকর ওরা। আজ আর সন্দেহ নেই। আমি পাঁচটাকার একখানা নোট বের ক'রে দিয়ে বললাম—এ তোমাকে মদ খেতে দেব না। তোমাদের ছেলের জন্যে দিচ্ছি। ওকে কিছু কিনে দিয়ো।

হাতটা সঙ্গে সঙ্গে সে পিছিয়ে নিলে।—না—তা পারব না।

মেয়েটিও ঘাড় নাড়লে—না-না-না।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন?

বললে—তাই পারি বাবু? বকশিশ তো একরকম ভিক্ষে গো। আমরা ছোট কাজ করি বকশিশ নি। ও ছেলেটা তো ছোটলোকের ছেলে নয়। ছেলেটা যে আমাদের নয় গো!

বিস্ময়ের অবধি রইল না। জিজ্ঞাসা করলাম—তোমাদের ছেলে নয়?

—না। আনন্দ-উজ্জ্বল মুখখানা এক মুহূর্তে উদাস হয়ে গেল। যেন উদয়লগ্নের পূর্বাকাশ এক মুহূর্তে অস্তলগ্নের পশ্চিমাকাশের রক্তরাগে রূপান্তরিত হয়ে বিষণ্ণতায় ছেয়ে গেল।

—কার ছেলে? জিজ্ঞাসা করলাম।

—নতুন গাঁয়ের সদ্‌গোপের ছেলে গো! বাবা মা মরে গেল কলেরায়—ছ' মাসের ছেলেটা খুড়োখুড়ীর ঘাড়ে পড়েছিল। ট্যাঁ-

ট্যাঁ করে কাঁদছিল। খবর পেলাম—পেয়ে গেলাম। নিয়ে এলাম চেয়ে। বললাম, মানুষ ক'রে দি। তাই মানুষ করছি। বড় হবে—তখুন দিয়ে দিব ফিরে। ওকে কি বকশিশ কি ভিক্ষের টাকায় খাওয়াতে পারি? না ঐ টাকায় জামাকাপড় দিতে পারি?

মেয়েটা ঘাড় নাড়লে—না-না-না!

বাবুরাম বললে—এটাকে নিয়ে পাঁচটা বাচ্চা মানুষ করলাম বাবু! হাঁ। পাঁচটা। একটা হাতের সব আঙুলগুলো মেলে ধরলে।

মেয়েটা বললে—মেহনতের পয়সা ছাড়া বাড়তি রোজগারের এক পয়সার কিছু কাউকে খাওয়াইনি পরাইনি বাবু!

· বাবুরাম বললে—সব বাচ্চা কটাকে এই তাগড়া ক'রে মানুষ করেছি বাবু! এইসা তাগড়া! হাঁ। ভদ্দর আদমীদের বাচ্চার চেয়ে ভাল খাইয়েছি পরিয়েছি। সুখীয়া খুব ভাল কাম জানে বাবু। হাসপাতালমে ছিল কিনা! ডাক্তার বাবুর বাড়িতে এ কাম ভাল করে শিখেছে।

প্রশ্ন করলাম—কিন্তু এতে তোমার কষ্ট হয় না?

প্রশ্নটা ওরা বুঝতে পারলে না। সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে—কিসে?

—এই ভাবে মানুষ ক'রে ফিরে দিতে?

হা-হা ক'রে হেসে উঠল বাবুরাম।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেয়েটা ঘাড় নাড়লে। কি বলতে চাইলে বুঝতে পারলাম না।

পাঁচটা টাকাই সেদিন আমি ওকে দিয়ে দিলাম, বললাম—বেশ, তোমাদেরই দিলাম—নাও।

* * *

সেদিন সন্ধ্যার সময় বসে বই পড়ছিলাম! আমাদের গ্রামে গেলে আমি প্রায় একঘরে হয়ে থাকি। আত্মীয়স্বজন—ভদ্র

বন্ধুজনে বড় একটা কাছ ঘেঁষে না। তারা যে সব গ্রাম্য-জীবনের ঝগড়াঝাঁটির কথা বলে—অন্যের সমালোচনা করে, তা আমিও পছন্দ করতে পারি না—আমার সাহিত্যের কথাও তেমনি তাদের খুব ভাল লাগে না। সেখানে একমাত্র সঙ্গী বই।

গ্রামের পথে সন্ধ্যার পর ভিড় কম। সন্ধ্যার মুখে শুধু কলরব ক'রে খেলা শেষ ক'রে ফেরে ছেলের দল। তারা পার হয়ে গেলেই সব স্তব্ধ; পথখানা যেন ঘুমিয়ে পড়ে। ক্বচিৎ এক-আধ জন লোক চলে, কখনও চলে কুকুর বা গরু, বড় বড় তালগাছের মাথা থেকে আকাশপথে উড়ে যায় পেঁচা, দু'চারটে বাদুড়। আশপাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসে কোন উৎসাহী পড়ুয়ার কণ্ঠস্বর। অনেকটা দূরে বাউরী পাড়ায় ঢোলক-কাঁসি বাজিয়ে ভাসান গান বা ভাঁজোগান হয়—এই পর্যন্ত। বাজার পাড়ায় অনেক গোলমাল অবশ্য। অনেক বাঁশি, অনেক কাঁসি, অনেক আয়োজন; হারমোনিয়াম মন্দিরা নিয়ে গানের আড্ডা, থিয়েটারের রিহার্শ্যাল। দোকানের বেচাকেনা হিসেব-নিকেশ বৈষয়িক সমারোহও আছে। কিন্তু আমাদের পাড়াটি, বিশেষ করে আমি গেলে আমার বাড়িটি একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে আমার জন্য। আমি বইয়ের মধ্যে প্রায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ আমার বাড়ির সামনের পথখানিকে সচকিত ক'রে ভরাট মোটা গলায় গান গেয়ে উঠল কেউ। কেউ কেন—অনেকটা দূরে গায়ক তখনও থাকলেও সে কেউ যে বাবুরাম তাতে সন্দেহ রইল না। কাছে এল কণ্ঠস্বর; এবার বুঝলাম—কণ্ঠস্বরে জড়িমা রয়েছে; মদ খেয়েছে বাবুরাম। ঘাড় ফিরিয়ে পথের দিকে চাইলাম। অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট দেখা না গেলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম—সে টলতে টলতে আসছে।

—বাবু মশায়! পেনাম! হাত জোড় করে দাঁড়াল বাবুরাম। তারপরই বললে—এত জোর আলোটা জেরাসে কমিয়ে নাও হুজুর!

বলেই সে পথ থেকে উঠে এসে বসল দাওয়ায়।

—দু'বোতল মদ কিনেছি—তোমার টাকায়। আমি একটা খেয়েছি। ইটার এই এতটা খেয়েছি। বাকীটা সুখী খাবে। নিয়ে যাচ্ছি। সেই ববুয়া—বাচ্চাটা গো, ঘুমায়ে যাবে—তবে সুখী খাবে। হাঁ। এই নটার ট্রেনে ফিরব বাড়ী সেই কিরিন্নার। কোম্পানীর কোয়াটার। হাঁ সেইখানে। সুখী বাবুয়াকে নিয়ে চলে গেল—বিকেলের গাড়িতে। আমি নটার গাড়িতে যাব। আমি যাই বাবু! ট্রেন ফেল ক'রে পড়ে থাকলে সর্বনাশ। হাঁ!

ব'লে রাঙা চোখ মেলে তর্জনীটি তুলে প্রায় মিনিট খানেক চুপ করে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে—বুঝেছ?

ঘাড় নেড়ে হেসে জানালাম—হ্যাঁ, বুঝেছি।

বার বার ঘাড় নেড়ে বাবুরাম বললে—উঁহু-উঁহু—কিছু বুঝ নাই। ছাই বুঝেছ। সুখী জেগে বসে থাকবে। ভাববে, কি করেছি—হয়ত বা মরেছি বা মরছি—সাপে কেটেছে, নয়তো পড়ে গিয়েছি, মাথা ফেটেছে। আর আমার সারারাত ঘুম হবে না। মানে কিনা—ববুয়াটা ঘুমাবে না। বলবে, বাবা কই এল? হাঁ!

সেই তর্জনী তুলে রাঙা চোখ মেলে চেয়ে রইল আবার। আমি প্রত্যাশা করছিলাম—এইবার জিজ্ঞাসা করবে, বুঝেছ? কিন্তু তা আর করলে না। হঠাৎ উঠল, বললে—চললাম। ট্রেন ফেল হয়ে যাবে।

চলে গেল টলতে টলতে—আমি বইয়ে মন দিলাম। কিন্তু মন তখন বাবুরামের পিছনে ছুটেছে। ভাবছিলাম ওরই কথা। হঠাৎ চমকে উঠলাম একটা ভারী কিছুর পড়ে যাওয়ার শব্দে। বেশ ভারী একটা কিছু; বেশ জোর শব্দ উঠেছে। আলোটা তুলে নিয়ে বারান্দার ধারে দাঁড়িয়ে পথের উপর আলো ফেলে দেখতে চেষ্টা করলাম। দেখলাম বাবুরাম। বাবুরাম পড়ে গেছে। ধূলো ঝেড়ে উঠে সে বললে—ফিরে এলম।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন? আবার ফিরলে কেন?

—ফিরলম। যে কথাটা বলতে এলম—সেটা বলতে ভুলে গেলম।

—কি সে কথা?

—হাঁ সে কথা—। বলতে বলতে সে ধপ করে বসে পড়ল।

—তুমি তখুন শুধালে না—বাচ্চাগুলাকে মানুষ ক'রে ফিরে দিই, কষ্ট হয় না? শুধাও নাই?

মনে পড়ে গেল কথাটা। জিজ্ঞাসা করেছিলাম বটে। বাবুরাম হা-হা ক'রে হেসেছিল। কথা বলে নি। ওর বউ সুখী ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল—না-না-না।

—সেই কথাটা। হাঁ। সেই তর্জনী তুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

আমি বললাম—হ্যাঁ। তখন তো তুমি হা-হা করে হেসে উঠলে।

—হাঁ। হেসে উঠলাম। এখন কথাটা হল—এই যে আমার বহুটা, ওই সুখীটা—বুঝলে?

বললাম—হ্যাঁ। সুখী কি বল?

—সুখীটা হাজারিবাগে পাদরীদের হাসপাতালে কাম করত। পাদরীরা উকে কেরেস্তান করবে ঠিক করেছিল। আমি ছিলম জমাদার। মেথর। কেরেস্তান হবার ভয়ে দু'জনাতে পালায়ে এলম। সি অনেক দিন। দু'জনাতে বেশ ছিলম বাবু! তবু বুঝেছ—মাঝে মাঝে আমার মনটি কেমন হয়ে যেত, আবার আমার মনটি ভাল থাকত—উ কেমন হয়ে যেত। বুঝেছ? বাবুরাম সেই রক্তস্রাঙা চোখে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল—ডান হাতের তর্জনীটি আপনা আপনি উচ্ছত হয়ে উঠল, কিন্তু একার আর স্থির রইল না—একটু একটু যেন কাঁপতে লাগল।

আমি বুঝতে পারলাম। বুঝতে পারলাম বলেই হাসি পেল না এবার। আমারও দৃষ্টিতে মুখে কিসের যেন ছায়া নেমে এল।

বাবুরাম বললে—হাঁ, তুমি ঠিক বুঝেছ গো। তেমনই লাগছে। শুন। একদিন আমি শুধালাম, কি তোর হয় সুখী? সুখী হেসে বললে—কিছু না। তু খেপা খানিকটা! একদিন সুখী শুধালে, কি তোর হয় বল্ দেখি? এমন ক'রে কি ভাবিস? আমি হেসে বললাম—কিছু না। তোর মাথা খারাপ বটে সুখী! গা গতর কেমন লাগছে! বুঝেছ?

উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই এবার সে বললে—একদিন—। বুঝেছ? একদিন হল কি—একসঙ্গে উওর মনটি কেমন হয়ে গেল—আমার মনটিও কেমন হয়ে গেল। এক সঙ্গে! বুঝেছ? দু'জনার মুখের দিকে দু'জনা তাকালাম—আর দু'জনাকে দু'জনার যেন বিষ হয়ে গেল। খুব ঝগড়া করলাম দু'জনায়। খুব মারলম আমি ওকে, উ আমাকে নখে করে ছিঁড়ে দিলে। কামড়ে দিলে। তা'পরে দু'জনাতে খুব কাঁদলম। তারপরে উ বললে—আমার ছেলে নাই পুলে নাই, আমার মন খারাপ হয়, তা বলে তু আমাকে মারবি? আমি মনে মনে দুখ করতে পাব না? বাবু আমার মনটিও তাই বলে উঠল—ছেলেপুলে হল না, খাঁ খাঁ করে চারিদিক—মন আপনি উদাস হয়, তা' কি করব আমি? তাই বলে তু গাল দিবি—ঝগড়া করবি—ঝাঁটা নিয়ে মারবি? বুঝলে? হাঁ।

—তা' পরেতে বাবু—একদিন শহরে—ছোট শহর বটে; বরাকর জান বাবু, বরাকর—শহর, কয়লার খাদ আছে, মন্দির আছে? জান? হু সেইখানে থাকি, খাদে চাকরি করি তখন। একদিন খাদের ডাক্তার ডেকে পাঠালে। কি? না—ধাওড়াতে একটা মেয়েছেলে মরেছে—আপন লোক পালায়ছে বাবু, কেন না—মেয়েটা মরেছে কাশ রোগে; কাশ রোগের মড়া ছুলে কাশ ব্যামো হয়, তাই মরদটো ভেগেছে, এখন সেই মড়াটা ফেলতে হবে। গেলম বাবু। আমাদের কাম বটে উটা। টাকাও মেলে মোটা। তবু

অনেক মেথর ভয় করে। বাবুরাম করে না বাবু। বাবুরামের জানের ডর নাই। গেলম। তো দেখলম—মা-টা মরে পড়ে রয়েছে—আর পাশে একটো ছেলে এই শিকুটির মত চেহারা পড়ে পড়ে ধুঁকছে। আমি বললম—ডাক্তার বাবু, মাটোকে ফেলে আসছি—ছেলেটোকে কে লেবে? ডাক্তার ওই উদের স্বজাত আর সব মানুষকে ডেকে বললে—ছেলেটাকে তোমরা কেউ লাও। তা—তারা বললে, কে লিবে? তখন আমি বললম—তবে আমি লিব ডাক্তার বাবু? ডাক্তার বললে—লিবি? লিয়ে কি করবি? উটাও তো মরবে রে। উ তো বাঁচবে না। বুঝলে?

একটু থেমে অকস্মাৎ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললে বাবুরাম। তারপর হাসলে। অট্টহাসি নয়—মৃদু নিঃশব্দ হাসি। তারপর বললে—তা' মরল না ছেলেটা। বাঁচল। দেখেছ তো সুখীর যত্ন? হাঁ সাদা শুঁয়াওলা তোয়ালে ছাড়া ছেলে নেয় না, পাউডার মাখায়। বোতলে দুধ খাওয়ায়, বিশবার সাবুন দিয়ে গরম জল দিয়ে বোতলটা ধোয়। উ সব হাসপাতালে শিখেছিল কি না! হাঁ!

বাবুরামের মত্ত দৃষ্টিতে স্বপ্ন-সুষমা ফুটে উঠল। তেমনি হাসি দুটি ঠোঁটে। মনে হল সে যেন একটা অতিকায় শিশু—দেয়ালা করছে, হাসছে।

বললে—ছ'মাসে ছেলেটা যা হল সে কি বলব তোমাকে এই দুটি ফুলা ফুলা গাল—মাথায় টোপর টোপর চুল; ববুয়া বলে ডাকলেই—খিলখিল হাসি! দুই আকাশে ছুড়ে দিতম—আর লুফে নিতম, খিলখিল করে হেসে ভেঙে পড়ত। হাঁ!

—বাস্। বাবু, মন আমাদের ভাল হয়ে গেল। আর খারাপ হ'ত না মন। ঘরের চারপাশে যেন ফুল ফুটে উঠল। বারো-মাস—বারোমাস বাবু সে ফুল ফুটে রইল। ঝরল না, শুকাল না। হাঁ!

—তারপরেতে বাবু! থেমে গেল বাবুরাম। একটু নড়ে-চড়ে

বোতলটা বের ক'রে খানিকটা মদ খেয়ে নিল। তারপর আবার সুরু করলে—হাঁ। তারপরেতে বাবু একদিন—ছেলেটা তখন তিন-চার বছরের হয়েছে; আমাকে বলছে বাবা, সুখীকে বলছে মা; ছেলেটার সেই আসল বাবা এসে হাজির হল। বললে—আমার ছেলে! দাও আমার ছেলে! বাবুরাম বাবু—বাবুরাম—বাঘ বটে সে। সে উঠল হাঁকিড়ে! হাঁ। ছেলেটা আগুলে—আঙুল দেখায়ে বললাম—যাও!

বাবুরাম প্রচণ্ড চীৎকারেই বলে উঠল—যা—ও!

সে যেন সত্যসত্যই চোখের সামনে সেই দিনের ছবিটা দেখছে। তার পালিত ববুয়াকে দাবী করে—ববুয়ার জন্মদাতা যেন তার সামনেই দাঁড়িয়ে আছে। তার চীৎকারে অন্ধকার চমকে উঠল, গাছের মধ্যে ঘুমন্ত পাখীর ঘুম ভেঙে গেল—বারান্দার ধারেই বড় মুচকুন্দ চাপা গাছে কোন পাখী পাখা ঝট্‌পট্‌ করে নড়ে-চড়ে বসল। রাস্তার পাশের আগাছার মধ্যে সরীসৃপের সঞ্চরণ শব্দ শোনা গেল। পাশের বাড়ীর ভিতরে চকিত ছেলেমেয়েরা—কে? কে? বলে সাড়া দিয়ে উঠল।

বাবুরাম হা-হা শব্দে অট্টহাসি হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বললে—ওই দেখ—কত জোরে চেঁচায়ে উঠলম দেখ! সুখী যে বলে—আমি খানিক পাগল—তা মিছে লয়!

আমি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললাম—নিজের অজ্ঞাতসারেই। তারপর প্রশ্ন করলাম—তারপর?

—তারপরে! হুঁ; তারপরে উ এল উদের জ্ঞাতিদের নিয়ে। খাদের কুলী! এই গাইতিশাবল নিয়ে! আমি বাবুরাম দাঁড়ালাম—ডাণ্ডা নিয়ে। মরি কি মারি। বাবুরামের ডর নাই। তখন এল বাবুরা! আমাকে ডেকে বললে—কিছু টাকা দিয়ে দে! ছেলেটার বাবা বললে—না-না—আমার ছেলেকে মেথর হতে দিব

না আমি। মাথায় করে ময়লা ফেলবে উ! না-না-না! বাবু বুকের ভিতরটাতে কে যেন আমার কলিজাটাকে খামচে ধরে মুচড়ে দিলে! আ—হা-হা বাবু! আঃ—! সামলে নিয়ে আমি বললাম—আমি উকে ময়লা বইতে দিব না। উকে লেখাপড়া শিখাব! বাবু, ডাক্তারবাবু আমাকে বড় ভালবাসত—সে এসে আমাকে বললে—তার চেয়ে বাবুরাম—দিয়ে দে ছেলেটা। বললম, দিয়ে দিব? আমার বুকটা কি করছে তুমি বুঝছ? ডাক্তারবাবু বললে—বুঝছি। কিন্তু উকে তু লিখাপড়া শিখাবি, তারপরে ছেলেটা লিখাপড়া শিখে তুই মেথর বলে তোকে বাবা বলতে লজ্জা করবে, হয় তো বা পলায়ে যাবে রে! তার চেয়ে উকে তু দিয়ে দে! আমি হাঁ হয়ে গেলম বাবু! হাঁ হয়ে গেলম। কিছু বলতে নারলম। সুখী আচমকা ছুটে এসে ছেলেটাকে তার বাবার ছামুতে নামায়ে দিয়ে আমার হাত ধরে টেনে ঘরে ঢুকায়ে—দরজাতে খিল লাগায়ে দিলে।

জিজ্ঞাসা করলাম—তারপর?

—সেই রাতে বরাকর থেকে পালায়ে এলেম। একবারে বর্ধমান। হাঁ! সুখী বললে—ডাক্তোর ঠিক বলেছে। সুখীর গাঁয়ের একটা ছেলে পাদরীদের কাছে কেরেস্তান হয়ে লেখাপড়া শিখে বাবাকে বাবা বলত না। কিন্তু আমি যেন ক্ষেপে গেলম। সুখীকে বেদম মারতম। বাবু, সুখী কম লয়। উও আমাকে মারত। হাঁ! শেষ কোথা থেকে একদিন আনলে একটা ছেলে; সেটা ডাগরডোগর ছেলে; তা আাট বছরের বটে। রোগ হয়ে পড়েছিল গাছতলাতে, নিয়ে এল। বাবু তাকে সারালম—ডাক্তার ডাকলম, ওষুধ দিলম, ডাঁটো করলম; তখন হারামজাদা একদিন আমাদের টাকাকড়ি চুরি করে পলায়ে গেল। দু'বছর পরে বাবু! হাঁ। আমি আবার ক্ষেপলম। ইবার ক্ষেপেছিলম—একেবারে খুনখারাপী ক্ষেপা। হাঁ!

অনেকক্ষণ পর আবার সে তর্জনী তুলে—লাল চোখ মেলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

কিছুক্ষণ পর আবার স্নুরু করলে—বেঁধে রাখত আমাকে। আর মারত। আমি খেতম না কিনা। কিছু খেতম না। তাতেই মারত! বুঝলে? হাঁ! তা—মারলে কি ক্ষেপা ভাল হয় বাবু? হয় না! যার জন্যে ক্ষেপে যায় মানুষ—তা না পেলে ক্ষেপা সারে না। বাবুরামের ক্ষ্যাপামী বাবু—। হা-হা-হা শব্দে হেসে উঠল বাবুরাম।

সে হাসতেই লাগল। হাসতেই লাগল।

আমি ডাকলাম—বাবুরাম! বাবুরাম!

সে হাসতেই লাগল। হা-হা-হা! হা-হা-হা!

হঠাৎ গ্রামের রাত্রির স্তব্ধতা চিরে বেজে উঠল বাঁশির শব্দ। রেলের বাঁশি। চমকে উঠে থেমে গেল বাবুরাম।

ট্রেন আসছে!

কোন রকমে সব গুটিয়ে-পুটিয়ে নিয়ে সে টলতে টলতে ছুটল। অন্ধকারের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর—মোটা ভরাট কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম শুধু।

মেরে গোপাল! মেরে গোপাল! মেরে গোপাল!
ববুয়ারে ববুয়ারে, বাবুয়ারে মেরে লাল!

* * * *

এ দু'বছর আগের কথা। এবার গ্রামে গিয়েছিলাম দীর্ঘদিন পর। বাবুরামের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। বাজারে সেদিন দেখলাম হঠাৎ লোকজন সরে যাচ্ছে। ভয় পেয়েছে সকলে। কি হল? বললে—বাবুরাম!

—বাবুরাম? তা কি হল?

—বাবুরাম ক্ষেপে গেছে।

—ক্ষেপে গেছে ?

—হ্যাঁ। ওই তো!

দেখলাম বিশালদেহ বাবুরাম সর্বাঙ্গে ময়লা মেখে হা-হা হা-হা —শব্দে হাসতে হাসতে চলে আসছে। দূরে পিছনে ছুটে আসছে সুখীয়া। হাতে একটা লাঠি তার।

সুখী বললে—ছেলেটাকে দিয়ে দিয়েছি বাবু তাই ও ক্ষেপেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন ? দয়ে দিলে কেন ? তারা—?

—না। তারা চায় নি। আমরাই দিয়ে দিলাম। তিন বছর বয়স হয়ে গিয়েছিল—ভাত না খেয়ে থাকবে কেন ?

—তা' ভাত দিলেই তো পারতে ?

—না। তা দিই না। দুধ—শুধু দুধ মিষ্টি ছাড়া ভাত দিই না বাবু!

—কেন ?

—না। ভাত দিলে ছেলে ফিরে দেবার ক্ষণ পাব না বাবু! ছেলে বড় হয়ে যাবে। কারুর জাত গিয়েও কাজ নেই, ছেলে বড় করেও কাজ নেই।

বুঝতে পারলাম না কি বলছে সুখীয়া।

সুখীয়াই বললে—ছেলে বড় হয়ে গেলে আর ছেলে কোথায় থাকল বাবু? গোপাল কানাই হয়ে গেলেই পালায়। মায়ের ধন থাকে না। বড় হয়ে বলবে, আমার জাত মারলি ?

মাসখানেক পর আবার দেখা হল ওদের সঙ্গে। স্টেশন প্লাটফর্মে।

সুখীয়ার কোলে সাদা টার্কিশ তোয়ালেতে একটি শিশু।

বাবুরাম পাশে বসে আছে। তার চোখের লাল এখনও কাটেনি। কিন্তু সে পাগল আর সে নয়। মধ্যে মধ্যে ছেলেটার গাল টিপে দিয়ে, অট্টহাসি হেসে উঠছে—হা-হা-হা! হা-হা-হা!

# হৈমবতার প্রত্যাবর্তন

সাধারণ লোকে বলত খাণ্ডারণী। যারা লেখাপড়া জানে—তারা কেউ বলত দুর্গাবতী, কেউ বা বলত লক্ষ্মীবাঈ। অর্থাৎ ঝান্সীর রাণী: আজাদ হিন্দ্ ফৌজের নারীবাহিনীর নাম ঝান্সীবাহিনী হওয়া থেকে ওই নামটাই বেশী চলিত হয়েছিল। কিন্তু মুখের সামনে ওসব বলবার সাহস ছিল না কারুর। নিঃসন্তান বালবিধবা এই মেয়েটি যেন আগুনের মতই সারা জীবন জ্বলছে। এবং অনির্বাণ জ্বলবার পক্ষে সব চেয়ে সুবিধা করে দিয়েছিল তার ভাগ্য। হোমকুণ্ডে অগ্নিস্থাপনের মত তাকে বিবাহসূত্র চিতুরার চাটুজ্জেদের বাড়াতে এনে ফেলেছিল। ছোট গ্রাম চিতুরা, বলরাম চাটুজ্জে—চাটুজ্জে বাড়ীর একমাত্র মালিক। সেকালে অবস্থাপন্ন ঘর বলতে যা বোঝায়—তাই ছিল চাটুজ্জে বাড়ী। চিতুরা গ্রামখানার জমিদার, স্বত্বে অর্ধেকের অধিকারী, বাগান-পুকুর, ক্ষেত-খামার; লোকে বলত—দুধে-ভাতে অবস্থা। চিতুরা গ্রামের মাত্র হাজার টাকা আয়। তারই অর্ধেক। কিন্তু সেকালে ধান চাল মাছ দুধের সঙ্গে পাঁচশো টাকা কম কি ছিল! বাড়ীতে নারায়ণশিলার সেবা; একাধারে লক্ষ্মীনারায়ণ ঘরে বাঁধা। বলরাম চাটুজ্জে নিজেও ছিলেন যেমন গোঁড়া ব্রাহ্মণ তেমনি ছিলেন প্রতাপান্বিত গ্রামশাসক, জমিদারীর অহঙ্কারও কম ছিল না।"

জীবনে পরের মাটিতে পা দেননি। গ্রাম ছিল তাঁর জমিদারী। মাটিই তাঁর। গ্রাম থেকে বের হয়ে সরকারী শড়ক ধরে

চলতেন। সরকারী শড়ক পরের মাটি নয়। গ্রামের বাইরে কোন পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে তিনি কোন দিন হাঁটেন নি। হৈমবতী বলরাম চাটুজ্জ্যের দ্বিতীয় পক্ষের নিঃসন্তান পত্নী। স্বামীর স্বভাব এবং সম্পত্তিতে অধিষ্ঠাতা হয়ে হৈমবতী ওই নাম অর্জন করেছেন। খাণ্ডারণী। দুর্গাবতী। ঝান্সীর রাণী!

একালের তুখোড় ছেলেরা হৈমবতীর বাড়ীর পাশ দিয়ে যাবার সময় চিৎকার করে উঠত—মেরি ঝাঁসী নহি দুঙ্গা! হৈমবতী সেকালের মেয়ে, ইতিহাস পড়েন নি—মানে বুঝতে পারেন না কিন্তু চিৎকারের মাত্রা একটু বেশী হলেই সাড়া দিয়ে ওঠেন—কে র‍্যা? কে? কার ছেলে?

কথাটার মানে বুঝলেন ১৩৬১ সালে। জমিদারী বিলোপ আইন পাশের খবর শুনে হৈমবতী স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কথাটা শুনছেন কিছু দিন থেকেই কিন্তু তাই বলে—ঠিক এই সময়েই সেদিন কটা ছেলে সমবেত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল—মেরি ঝাঁসী নেহি দুঙ্গা! চমকে উঠলেন তিনি। গোমস্তা হরিহরকে প্রশ্ন করলেন—কথাটার মানে কি বলতে পার হরিহর? আজ ঠিক এই মুহূর্তে ওদের সমবেত কণ্ঠে উৎসাহিত ধ্বনি শুনে তাঁর সন্দেহ হয়ে গেল—বোধ করি কথাটার সঙ্গে তাঁর কোথাও কোন একটা সম্পর্ক-সূত্র আছে। কথা কয়টা নিছক ছেলেদের খেয়ালের চিৎকার নয়।

হরিহর মাথা চুলকে বললে—ওসব শুনবেন না আপনি, কান দেবেন না।

—তা শুনব না। কিন্তু মানেটা বুঝিয়ে দাও দেখি!

মানে না বুঝে তিনি ছাড়লেন না এবং মানে বুঝে মুখ চোখ লাল হয়ে উঠল। হরিহরের ভয় হল হয়তো বা হৈমবতী রাগে চেতনা হারিয়ে বেরিয়ে যাবেন। কিন্তু তা তিনি গেলেন না। কোন রকমে আত্মসম্বরণ করে তিনি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

বিকেলে কিন্তু নিজে বেরিয়ে ছেলেদের বাপের পাড়ায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন—শোন্ তো সব। এদিকে আয়।

একালে জমিদারের প্রতাপ অনেক দিনই গেছে—কিন্তু হৈমবতীর প্রতাপ যায় না, যাবার নয়। গৌরবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী প্রৌঢ়া চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি, মুখে রূঢ় ভাষা—এর প্রতাপ কবে যায় বা যাবে? হৈমবতীর অভিশম্পাত অতি রূঢ়। তাই ছেলেদের অভিভাবকেরা অস্বচ্ছন্দ হয়েই বললে—আজ্ঞে মা?

—তোরা ভেবেছিস কি?

—আজ্ঞে?

—নালিশ করব আমি গভরমেণ্টের নামে।

—আজ্ঞে?

—ন্যাকা সাজছিস? কিন্তু শোন্ সর্বস্ব বিক্রি করে আমি লড়ব। যদি হারি তবে দামোদরকে গলায় ন্যাকড়া জড়িয়ে বেঁধে এখান থেকে চলে যাব।

তা হৈমবতী পারেন। মামলা মকদ্দমা তিনি অনেক করেছেন। গোমস্তা মারফতে নয়, নিজে সদরে গিয়ে উকিলদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের কথা বুঝে নিয়ে তবে তাঁদের ছেড়েছেন এবং নিজের কথা বুঝিয়ে তবে ক্ষান্ত হয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর পর উইল নিয়ে মস্ত মামলা হয়েছিল। উইল প্রবেট না হলে তাঁকে এ বাড়ী থেকে এক বস্ত্রেই হয় তো বেরিয়ে যেতে হ'ত। মামলা হয়েছিল—বলরাম চাটুজ্জের প্রথম পক্ষের একমাত্র পুত্র হৈমবতীর সতীনের সন্তান নীলুর সঙ্গে। সে অনেক কাণ্ড।

নীলুর জন্যই বলরাম অনেক দেখে শুনে অনেক মেয়ের মধ্যে পছন্দ করে হৈমবতীকে ঘরে এনেছিলেন। হৈমবতী নিজেও সৎমায়ের হাতে বড় হয়েছিল, এমন সৎমা এবং এমন সৎমেয়ে এ নাকি সেকালে কেউ দেখে নি। হৈমবতীর নিজের মা ছিল প্রখরা ও মুখরা কিন্তু সৎমা ছিল মধুভাষিণী; সেকালে হৈমবতীরও

মুখে মধু ছিল। নয়নে মধু বচনে মধু রূপে মধু গুণে মধু—মধু ছিল হৈমবতীর ভিতরে বাহিরে সর্বত্র। একথা আজ কেউ বিশ্বাস করে না, কিন্তু ছিল। তিন বছরের মাতৃহীন নীলু সদ্য বিবাহিতা বধূটির কোলে চেপে একমুহূর্তে মধুর ভাণ্ডারে মক্ষিকার মত জীবনের বাসায় বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। আজ থেকে পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগের কথা—পনের বছরের নববধূ হৈমবতী। সেকালের পুণ্যিপুকুর সেঁজুতি ব্রত করা মেয়ে, সৎমায়ের কল্যাণে পাঠশালাতেও কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন। পুতুল-খেলায় অভ্যস্ত মেয়ে। একালের মেয়ের তুলনায় অন্য যোগ্যতা তাঁর কম ছিল কিন্তু এক মুহূর্তে বাড়ীর গৃহিণী হতে এবং নীলুর মা হতে যে যোগ্যতা এবং মনের গড়ন দরকার তা তাঁর পূর্ণমাত্রায় ছিল। তিনিও মেতে উঠেছিলেন নীলুকে নিয়ে। বলরাম চাটুজ্জে খুশী হয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন স্ত্রীকে। বয়সের পার্থক্যে বলরাম বৃদ্ধ স্বামী ছিলেন না। নীলুই তাঁর প্রথম সন্তান। বয়স ছিল তাঁর ত্রিশ। যা একালের প্রথম পক্ষ পাত্রের বয়স। কিন্তু মনে মনে ছিলেন পঞ্চাশোর্ধ বয়স্কের মত প্রবীণ। ত্রিশ বৎসর বয়সেই থান ধুতি পরতেন তিনি। কাজেই তরুণী পত্নীকে সমাদরের পরিবর্তে আশীর্বাদ করতে তাঁর বাধে নি। সেকালের মেয়ে হৈমবতীও অবনত মস্তকে গভীর ভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর তরুণচিত্ত এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি। এবং সেই আশীর্বাদকে ফলবতী করে তুলতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। বাপের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। নীলুকে নিয়েই তিনি বাপের বাড়ী গিয়েছিলেন। আব্দেরে ছেলে ছিল নীলু। তার আব্দার এবং হৈমবতীর সেই আব্দার রাখার বহর দেখে হৈমবতীর বাপ বলেছিলেন—এতটা ভাল নয় হৈম। তোর নিজের ছেলে হলে তখন কষ্ট পাবি বলে দিচ্ছি। এত কেন?

হৈমবতী বলেছিলেন—আশীর্বাদ কর বাবা ওই আমার কোল জুড়িয়ে থাক, আমি আর ছেলে চাই নে।

—কি বললি? অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন বাপ। তারপর বলেছিলেন—ওরে সতীনের ছেলে আর নিমে সমান। ঘি দিয়ে ভাজলেও মিষ্টি হয় না।

এর পর আর একদিন হৈমের অনুপস্থিতিতে নীলুর দুরন্তপনা দেখে তিনি বলেছিলেন—এই আল্লাদেপনা দেখলে আমার রাগ ধরে। এবং কষে কান দুটিও মলে দিয়েছিলেন। হৈম বাড়ী ফিরতেই নীলু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলেছিল—দেখ মা, দাদু আমার কান মলে কি রকম ফুলিয়ে দিয়েছে। আর বললে—।

হৈম ঠিক তার পরদিনই গরুরগাড়ী ভাড়া করে নীলুকে নিয়ে চলে এসেছিলেন। আসবার সময় বাপ বলেছিলেন—দুটো কান মলে শাসন করেছি আর দুটো কথা বলেছি বলে এত হৈম? কিন্তু ও ছেলের ভবিষ্যতে হবে কি?

বলরামের গৌরবে গৌরবান্বিতা হৈম হেসে বলেছিলেন—কি আর হবে? ওকে তো আর দশজনের মন রেখে চলতে হবে না। ও জমিদারের ছেলে।

সেই নীলু বার বছর বয়সে পড়তে গেল নিজের মামার বাড়ী, শহরে। যাবার সময় হৈমবতী বলেছিলেন—দেখিস বাবা, কথায় আছে সোনায় বাঁধা আগ্‌নে—তাতে বেড়ায় ভাগ্‌নে। মামার বাড়ীতে গিয়ে মাকে যেন ভুলিস নে।

নীলু বলেছিল—ধেৎ। আমি ওদের বাড়ী থাকবই না। আমি বোর্ডিংয়ে থাকব।

কথা তাই ছিল। বলরামও চান নি যে, নীলু মামার বাড়ীতে থাকে। জমিদারের ছেলে মামাই হোক আর যেই হোক—পরের ভাতে পোষ্য হবে কেন? তাছাড়া নীলুর নিজের মামারা পাখা-ওঠা-পিঁপড়ে। বলরাম তাই বলতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘর; নীলুর মাতামহের পেশা ছিল গুরুগিরি। বলরাম যখন বিবাহ করেছিলেন, তখন তাই ছিল। তারপর এক শিষ্যের সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট

বোর্ডের ঠিকাদারি সুরু করে নীলুর মামা অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। পেশাটাই গিরি থেকে দারি বা টারিতে অর্থাৎ গুরুগিরি থেকে ঠিকাদারি বা কণ্ট্রাক্টারি হয়ে দাঁড়াল। একেবারে সেকালের নব্যতান্ত্রিক হলেন। বিয়ের সময় বলরাম শ্যালকদের বলতেন— পটোঝাড়া বামুন। এখন শ্যালক বলতে লাগলেন—জমিদার না ড্রোন্‌স্‌। ছেলেকে পড়তে পাঠাবার সময় বলরাম শ্যালককে লিখলেন—নীলুকে তোমাদের ওখানেই পাঠাইতেছি। সে বোর্ডিংয়েই থাকিবে। তোমরা দেখাশুনা করিবে অন্ততঃ এই ভরসাটুকু রাখি।

বলরাম চাটুজ্জে বলতেন—ভুল করেছি। জীবনে ওই একটা ভুল।

বৎসর কয়েক পরেই নীলুর পরিবর্তন দেখা গেল। ধরা পড়ল—সেবার ছুটির সময় বাহির বাড়ীতে নীলুর ঘরে পাখীর মাংসের কুচো হাড় থেকে। তক্তাপোষের তলা পরিষ্কার করতে গিয়ে পেলেন হৈমবতী নিজে। অনেকগুলি হাড়—সরু লম্বা। বৈষ্ণবের বাড়ীতে পাখীর হাড়? কোথা থেকে এল? বলরাম অনুসন্ধান করে বের করলেন—কীর্তি নীলুর। মাহিন্দার গোপাল বাউড়ীর সাহায্যে নীলু গোয়াল বাড়ী মুরগি রান্না করিয়ে রাত্রে ভক্ষণ করে। নীলুকে তিরস্কার করলেন, প্রায়শ্চিত্তের বিধান দিলেন। নীলু পালাল, গিয়ে হাজির হল মামার বাড়ীতে।

মামা লিখলেন—একালে মুরগি খাওয়ার জন্য মাথা মুড়ানোর ব্যবস্থা দিয়েছেন শুনে স্তম্ভিত হলাম। ছেলের মা না থাকিলে এমনই হয়। সৎমা বলিয়াই হাড়গুলি আপনাকে তিনি দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রভাবেই আপনি প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। যাহা হউক নীলু আমার এখানেই আসিয়াছে। এখানেই থাকিবে। লেখাপড়া শিখুক, মানুষ হউক—তাহার পর যদি সে সঙ্গত মনে করে তবে প্রায়শ্চিত্তাদি যাহা হয় করিবে।

বলরাম ছিলেন দোর্দণ্ড প্রকৃতির। তিনি নিজে গেলেন শহরে; শ্যালকের বাড়ীর সামনে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে ডেকে বললেন—বের করে দাও নীলুকে। নইলে আমি থানায় যাব।

নীলুকে জোর করে নিয়ে এলেন বাড়ী এবং মাথা কামিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে তবে ছাড়লেন। এবং হুকুম দিলেন—থাক পড়া এই পর্যন্ত।

হৈমবতী মাঝখানে পড়তে চেয়েছিলেন এবং পড়েছিলেনও। নীলুকে পিছনে রেখে নিজের বুকে বলরামের উদ্যত আঘাত নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নীলুই পিছন থেকে তাঁকে আঘাত হেনে সরে যেতে বাধ্য করেছিল। সত্যসত্যই বলরাম নীলুকে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন এবং হৈমবতী মাঝখানে নীলুকে ঢেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—না, আমাকে খুন কর তুমি তার চেয়ে।

বলরাম ক্ষান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু নীলু হয় নি। সে পিছন থেকে হৈমবতীকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে বলেছিল—সরে যাও বলছি। রাক্ষুসী কোথাকার। ডাইনী! এতক্ষণে মায়া-কান্না কাঁদতে এসেছে? এবং প্রায়শ্চিত্তের পর সেইদিন রাত্রে নীলু ঘরের চাল কেটে বের হয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিল।

নিরুদ্দেশ হয় নি—মামার বাড়ীতেই সে গিয়েছিল—মামারাই তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এর পরই সে দিল নিষ্ঠুরতম আঘাত। মামাদের পরিচালনায় নীলুই আদালতের দ্বারস্থ হল। দরখাস্ত করলে—তার বাবা বিমাতার প্রভাবে তার প্রতি স্নেহ-শূন্য। নিষ্ঠুর অত্যাচার করেন। সুতরাং সে আত্মরক্ষার জন্য মামার কাছে থাকতে চায়। আদালত সেই মর্মে নির্দেশ দিয়ে মাতৃহীন অসহায় বালককে রক্ষা করুন। তার সঙ্গে নীলুর মামা পড়ার খরচ দাবী করে দরখাস্ত করলেন।

বলরাম আদালতে গিয়ে বলে এলেন—ওই ছেলে তাঁর ত্যাজ্যপুত্র। সুতরাং সে যেখানে খুশী থাকতে পারে। তাকে তিনি কোন দিনই

ঘরে নিয়ে যেতে চাইবেন না। এবং ত্যাজ্যপুত্রকে তিনি কোন খরচা দিতে বাধ্য নন।

আদালত সে কথা শোনে নি। নীলুকে আঠার বছর বয়স পর্যন্ত মাসিক পঁচিশ টাকা খরচা দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। হৈমবতী শয্যা পেতেছিলেন। উঠতে হল স্বামীর অসুখে। বলরাম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হলেন। হৈমবতীকে সংসার এবং বিষয়ের ভার নিতে হল।

হৈমবতীর আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। যে হৈমবতী নব-বধূরূপে ছিল মধুর ভাণ্ডারের মত, সেই হৈমবতী হয়ে উঠল উগ্র বিষভাণ্ডের মত কটু। যে ছিল আরতির ঘৃত-দীপের মত স্নিগ্ধ, সে হল গৃহদাহী বহ্নির মত প্রখর। বলরাম চাটুজ্জে মারা গেলেন আরও তিন বছর পরে। মৃত্যুর পূর্বে উইল করে গেলেন; নীলুকে সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে হৈমবতীকে করে গেলেন বিষয়ের একচ্ছত্র উত্তরাধিকারিণী। নীলু সেই উইল নাকচের জন্য মামলা করলে। উইল জাল। তার সঙ্গে আরও অনেক কথা। কটু কুৎসিত অভিযোগ। হৈমবতী ডেকে পাঠালেন নীলুকে। নীলু লিখেও জবাব দিলে না। পত্র-বাহককে মুখে বলে জবাব পাঠালে—হয় মামলা জিতে যাব; নয় তো ওই সম্পত্তি যখন নিলেমে বিক্রি হবে তখন নীলেম ডেকে কিনে যাব।

হৈমবতীর চোখের জল মুহূর্তে শুকিয়ে গেল। অকস্মাৎ শোকের মেঘে বৈশাখের সূর্যের মত যে জীবন-প্রখরতা ঢাকা পড়েছিল—মেঘ কেটে সেই সূর্য আত্মপ্রকাশ করল।

স্বামীর ক্যাম্বিসের ব্যাগে কাপড় গামছা এবং পূজার্চনার জিনিসপত্র পুরে তিনি গোমস্তাকে সঙ্গে নিয়ে সদরে এসে হাজির হলেন। নীলুর মামার বাড়ীতে নয়, উকিল বাড়ীতে। সেই শুরু। নীলু মামলায় হারল, কিন্তু হৈমবতী আর মামলার তদ্বির ছাড়লেন না। এবং মামলা যেন তাঁর নেশায় দাঁড়াল। দিনান্তে

একবার তিনি গ্রাম পরিভ্রমণ করতেন। কার কোথায় নূতন ঘর হচ্ছে, কে কোথায় নূতন জমি কাটাচ্ছে, সেখানে তাঁর সূচাগ্র পরিমাণ জমি তারা চাপিয়ে নিচ্ছে কিনা দেখে আসতেন। যেখানেই সন্দেহ হ'ত সেখানেই নিজে দাঁড়িয়ে চার হাত লম্বা দাঁড়া দিয়ে জমি মাপ করাতেন। গোমস্তা মাপত, তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। কখনও নিজেই এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াটা গোমস্তার হাত থেকে টেনে, প্রায় কেড়ে নিয়ে বলতেন—দাঁড়া যে লাফিয়ে চলছে গো। দাঁড়া চলবে শুয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করার মত। এমনি করে, এমনি করে! হ্যাঁ। পেট ভরে আছে বুঝি, গুড়ি হয়ে দাঁড়াটা মাটিতে শোয়াতে পারছ না।

এই থেকেই তিনি খাণ্ডারণী। এ থেকেই আজকালকার ছেলেরা ঝান্সীর রাণীকে আবিষ্কার করে চীৎকার করে—মেরি ঝাসী নেহি দুঙ্গি!

এতকাল চিৎকারটাই কানে ঠেকত তাঁর। আজ মানেটা পরিষ্কার হল। তিনি জ্বলে উঠলেন, বললেন—গভরমেণ্টের নামে আমি মামলা করব।

ছেলেগুলোর বাপের বাড়ী গিয়ে মুখের উপর বলে এলেন।

আসবার সময় একবার সরকারী কালীতলায় দাঁড়িয়ে চারিদিক চেয়ে দেখলেন। এ.সব তাঁর। কেড়ে নেবে বললেই হল? কি নিয়ে থাকবেন? ঘর থেকে বেরুবেন কি করে? চিরটা কাল নিজের মাটি ছাড়া হাঁটেন নি, পা দেন নি। আজ শেষ বয়সে—। তিনি যথাসর্বস্ব পণ করে মামলা লড়বেন।

*　　　*　　　*

সদর শহরে গিয়ে হৈমবতী কিন্তু দমে গেলেন। উকিল হেসে বললেন—তা কি করে হবে ঠাকরুণ? দেশের দাবী। এ্যাসেম্বলীতে আইন পাশ করে জমিদারী লোপ হচ্ছে। পার্লামেণ্টে আইন

করে সব বাধা বিঘ্ন ঘুচিয়ে দিচ্ছে। এ মামলা করে কি করবেন? বড় বড় রাজা মহারাজারা চুপ করে গিয়েছে। আমাদের মহারাজা নিজের বসতবাড়ী বাদে আর সব বাগানবাড়ী, গেস্ট-হাউস, গোশালা, আস্তাবল সব বিক্রি করে দিচ্ছেন। বাগানবাড়ীর ওখানে গেলে দেখতে পাবেন আসবাবপত্র একেবারে স্তূপাকার করে ঢেলে নিলেম করে বিক্রি করে দিচ্ছে। খাস রাজবাড়ীর সামনে দেখতে পাবেন—তিরিশ-চল্লিশখানা সে আমলের ঘোড়ার গাড়ী, ব্রহাম-ল্যাণ্ডো ফিটন পড়ে আছে। সব বিক্রি হবে।

অভিভূত হয়ে গেলেন হৈমবতী। অভিভূত ভাবেই প্রশ্ন করলেন—বিক্রি করে দিচ্ছেন?

—হ্যাঁ। কি করবেন? দেশেই থাকবেন না।

তিনি সত্যসত্যই দেখতে গেলেন। দেখলেন উকিল একবিন্দু মিথ্যে বলেন নি। ট্রাক, গরুর গাড়ী, ঠেলা বোঝাই করে রাশি রাশি জিনিস চলেছে। চেয়ার, টেবিল, আয়না, ব্রাকেট, ঝাড়লণ্ঠন, ছবি, আলমারি, বই, মূর্তি কত বিচিত্র আসবাব যা হৈমবতী চোখেও দেখেন নি।

হৈমবতী নীরব হয়ে গেলেন। এবং বাড়ী ফিরে এসে ঘরের দুয়ার বন্ধ করলেন।

তিনি এখানে থাকবেন কি করে? কোন্ মুখে বের হবেন পথে? নীলু হাসবে। জমিদারী গেল! লক্ষ্মীজনার্দনের সেবা? কি করে চলবে? ক্ষতিপূরণ? হায় ক্ষতিপূরণ!

না, তিনি এখানে থাকবেন না। লক্ষ্মীজনার্দন-শিলাকে গলায় বেঁধে তিনি চলে যাবেন বৃন্দাবনে।

হ্যাঁ পথ তিনি পেয়েছেন। এই পথ। যেদিন জমিদারী যাবে, সেইদিন সকালে তিনি চলে যাবেন। নিঃশব্দে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে তিনি চলে যাবেন।

তাই গেলেনও।

১লা বৈশাখ। ১৩৬২ সাল।

নীলকান্ত চাটুজ্জে দশটার সময় ডিস্ট্রিক বোর্ড অপিসে যাবার জন্য বের হচ্ছেন। ডিস্ট্রিক বোর্ডের পেটি ঠিকাদার। শহরের একপ্রান্তে ছোট একতলা একখানি বাড়ী। এখনও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে নাই। সামনে বারান্দায় ঝিলমিলি হয় নি, কনক্রিটের ছাদ থেকে শিক বেরিয়ে আছে। অর্ধেক পলেস্তারা হয় নি, আরও অনেক কিছু অসম্পূর্ণ। জীবনে বহু উত্থান-পতন হয়েছে; অবশ্য উত্থানও বড় নয়, পতনও বড় নয়। নীলুর মামাতো ভাইরা অনেক করেছে। যুদ্ধের সময় লক্ষ টাকা উপার্জন করেছে। নীলু পারে নি। নীলুর মেজাজ ভাল নয়। কর্তাদের সঙ্গে ঝগড়া করে। ঘুষ দিতে গররাজী নয়, কিন্তু দেবার প্রস্তাব করতে পারে না। তবু চলে যাচ্ছে। পঞ্চাশের কাছে এসেছে বয়স। চুলগুলি সব পেকে গেছে। মুখে চোখে একটা কঠোর জড়তার ছাপ পড়েছে। বাইসিক্লখানা নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পথে নেমেছেন। একখানা সাইকেল-রিক্সা এসে দাঁড়াল। নামলেন হৈমবতী! নীলু চিনতে পারলেন না।—কে? কোথা থেকে আসছেন?

—নীলু? স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে হৈমবতীকে প্রশ্ন করলেন।—এমন বুড়ো হয়ে গিয়েছিস বাবা?

অবাক্ হয়ে গেল নীলু।—কে? মা? আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে হৈমবতীকে দেখছে নীলু। চিনতে পারলেও বিশ্বাস হচ্ছে না।—মা?

—হ্যাঁ। বৃন্দাবন যাব বাবা। জমিদারী তো গেল। তোমাকে ক্ষতিপূরণের টাকার কাগজপত্র সই সাবদ করে দিয়ে যাই। টাকা নিয়ে আমি কি করব বাবা। তোমার টাকা তুমি নাও। এক পয়সা জমিদারীর আয় নষ্ট করি নি বাবা। বরং বাড়িয়েছি।

নির্বাক হয়ে নীলু মায়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। পঁয়তাল্লিশ বছর আগের একটি ছবি মনে পড়ল। নববধূ হৈমবতীর সেই

কোমল মধুর লাবণ্য ঢলঢল মুখের পানে সে তাকিয়ে; মধুর ভাণ্ডারে মধুমক্ষিকার মত অনির্বচনীয় শান্তি খুঁজে পেয়েছিল সে। মুহূর্তে রূঢ় কঠোর মানুষটির যেন কি হয়ে গেল। স্পর্শকাতর সুপরিপক্ক ফলের মত দুটি চোখ যেন ফেটে গেল—গড়িয়ে বেরিয়ে এল জলের দুটি ধারা।

—নীলু।

—মা।

—একবার বসতে হবে যে বাবা।

—কিন্তু বৃন্দাবন যাবে কেন?

—না বাবা আর থাকতে পারব না। কি নিয়ে থাকব?

—কেন জমি-জেরাত বাগান-পুকুর—

—ও সব তুই নিস।

—ঠাকুর—

নিজের বুকে হাত দিয়ে হৈমবতী হেসে বললেন—ঠাকুর আমি নিয়ে যাচ্ছি। নিজের যা জুটবে তাই ভোগ দেব। তাই প্রসাদ পাব। আজ তো আর জমিদারের অহঙ্কার নাই। হাসলেন তিনি। আবার বললেন—তা নইলে তোর সঙ্গে হয় তো দেখাই হ'ত না রে।

—আমার অনেক অপরাধ মা। কিন্তু সে সব আমি সজ্ঞানে করি নি,—মামারা— কথা আর বলতে পারলে না নালু। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল।—

—কাঁদিস নে বাবা! আমারও তাই মনে হ'ত।

—দুঃখ জীবনে অনেক পেলাম মা। কতবার—। আবার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। আবার বললে—একবার গ্রামে গিয়েছিলাম। ভাবলাম সন্ধ্যার পর চুপি চুপি গিয়ে ডাকব—মা। গেলামও, কিন্তু দরজার সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার রাগের চিৎকার শুনলাম—কতকগুলো ছেলেকে তুমি বকছিলে। সে চিৎকার শুনে

আমার ভয় হল। যদি আমাকে অপমান করে ফিরিয়ে দাও! চুপি চুপি ফিরে পালিয়ে এলাম।

হৈমবতী ও কথার উত্তর দিলেন না। তাঁর চোখ পড়েছিল নীলকান্তের বাইরের ঘরের দরজাটির ফাঁক দিয়ে উঁকি-মারা একখানি কচি মুখের দিকে। বছর চারেকের ছেলের একটি মুখ। বহু পুরাতন কালের একখানি কচি মুখের ছাপ ওই মুখের মধ্যে। আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন—কে রে? কেরে? ওটি? ওটি? এ যে তাঁর ছোট নীলু। সেই নীলু।

৫ই বৈশাখ কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছিল। খাসখামারের আমতলায় ছেলেদের ছুটোছুটি পড়ে গেছে। আম পড়েছে। ওরা কুড়ুচ্ছে! নীলকান্তের ছেলের হাত ধরে ছেলেমানুষের মতই এসে দাঁড়ালেন ঠাকরুণ হৈমবতী।

—কুড়োও বাবা—কুড়োও। ওরে তোরা সব নিসনে। ওকেও দুটো দে। ওরে। ওরে।

ছেলেরা থমকে গেল।

হৈমবতী বললেন—আমার ছেলে রে। আমার ছেলে নীলুর, ছেলের ছেলে। ওদের নিয়ে আজ ফিরে এলাম যে। কোন লজ্জা নাই, কোন সঙ্কোচ নাই, দুঃখ নাই। ভাঙার মধ্যে একি নূতন গড়া গড়ে দিলে—সেই, যে শুধু ভাঙে আর গড়ে—গড়ে আর ভাঙে। প্রশান্ত প্রসন্ন পৃথিবীতে তাঁর জীবনের সকল উত্তাপ নিঃশেষে কেটে গেছে যেন ব্যাধিমুক্তির মত। পরিপূর্ণ হয়ে গেছে জীবন নীলু ছেলের ছেলেকে পেয়ে।

---